আইনগত ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার চর্চা

উম্মে হাবিবা

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০১৫

ঘোষণাপত্র

বর্তমান গবেষণাটি একটি মৌলিক কাজ। গবেষণায় অন্যান্য সূত্র থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তা অভিসন্দর্ভে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ কোন অংশই ডিপ্লোমা অথবা ভিন্ন কোনো ডিগ্রির জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা হয় নি।

(উম্মে হাবিবা)
এম. ফিল. গবেষক
রেজি নং-১৩৩, শিক্ষাবর্ষ-২০০৮-০৯,
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উম্মে হাবিবা (রেজি:১৩৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-০৯, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক উপস্থাপিত "আইনগত ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার চর্চা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য জমাদানের অনুমতি দেওয়া হলো।

(ড. নাইমা হক)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পথিকৃতের নিদর্শন স্থাপন করেছে। এ গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে অনেকেই আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত তিনি আমার এ গবেষণা কর্মটির তত্ত্বাবধায়ক ড. নাইমা হক। যাঁর যথাযথ তত্ত্বাবধান ছাড়া এ গবেষণা কাজটি কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। গবেষণা কর্মটির শিরোনাম বাছাই করা থেকে শুরু করে গবেষণা পত্রটি লেখা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা, মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এ গবেষণা কর্মটি কখনও পরিপূর্ণতা পেত না। তিনি প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাই তাঁর অবদানকে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি।

বিভাগীয় শিক্ষক ও চেয়ারম্যান ড. প্রদীপ কুমার রায়, অধ্যাপক মিসেস রাশিদা আখতার খানম, অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ ও জনাব মোহাম্মদ দাউদ খাঁন, সহকারী অধ্যাপক নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ গবেষণা কাজে অনেক ডকুমেন্টারী তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে- যা আমি সংগ্রহ করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে। আর এ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ- তাদের প্রতি রয়েছে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ। তবে গবেষণা কর্মটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে স্বামী, ভাই-বোন, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে নানাভাবে আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও সহায়তা করেছেন। তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

উম্মে হাবিবা

ঢাকা, ৩০/১১/২০১৫

মুখবন্ধ

অধিকার সম্পর্কিত চর্চা আমাদের নৈতিক, আইনি ও রাজনৈতিক চিন্তা দখল করে আছে। এই চর্চা অতীতের যে কোন সময়ের থেকে বিংশ শতাব্দী এবং বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে অনেক বেশী গতিশীল ও ব্যাপক হয়েছে। এ আলোচনা মানব জীবনের এত সার্বিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় ধারণা করা হয় যে মানবসত্তার অস্তিত্বের মধ্যেই অধিকার বিষয়টি নিহিত হয়ে আছে।

অধিকার বিষয়টি আজ সর্বত্র আলোচনার টেবিলে এবং সকলের ভাবনার জগতে ঠাঁই করে নিয়েছে। কোনো দেশে যে সব অধিকার আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত সে সব অধিকার মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে সব অধিকার অপরিহার্য সেগুলোই মানবাধিকার। এ অধিকার সমাজের সকলের সমানভাবে প্রাপ্য, যার ভিত্তি হলো আইন। মানুষের জন্ম-মৃত্যু যেমন মানুষ থেকে অবিচ্ছিন্ন তেমনি মানবাধিকারও মানুষের সাথে অবিচ্ছেদ্য । এসব অধিকার মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। অধিকার বিষয়টি বর্তমানে শুধু আইনি চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রেও তা অবস্থিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে যুদ্ধের তান্ডবলীলায় বিশ্বে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় মানবিক বির্পযয় লক্ষ্য করা যায়। এই দুই বিশ্বযুদ্ধে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা মানুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারের ভিতকে নড়বড়ে করে তোলে। বিশ্বের বিবেকরূপে আবির্ভূত হয় জাতিপুঞ্জ এবং জাতিসংঘ ।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত হয় 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' ('Universal Declaration of Human Rights') এবং এর সর্মথনে সম্পাদিত ও অনুষ্ঠিত হয় বেশকিছু আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার চুক্তি এবং সম্মেলন। বহুজাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা মানুষের অধিকারের পাশে মানবাধিকারকে উন্নীত করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সংবিধানে মানবাধিকার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে, প্রণীত হয়েছে মানবাধিকার আইন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫০টির বেশি রাষ্ট্র এই ঘোষনাপত্রে অনুমোদন প্রদান করেছে ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাই আজকের মানবাধিকার পরিস্থিতি আলোচনা 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্র' কেন্দ্রিক হওয়াই সংগত বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। এই আলোকে বর্তমান গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য মানবাধিকারের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণপূর্বক আইনগত ও নৈতিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা। মানবজীবনের প্রয়োজনের সাথে

মানবাধিকারের সম্পর্ক চিহ্নিত করা এবং এক্ষেত্রে আইনগত ও নৈতিক অধিকার বিষয়ক আলোচনার মধ্যে গবেষণা কর্মটি সীমাবদ্ধ রয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়ে মানবাধিকারের সংজ্ঞা প্রদান ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের চিন্তার মাধ্যমে মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক, রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে মানব জীবনের কোন কোন দিকে মানবাধিকারের পরিধিকে ব্যাপ্ত করা যায় সেগুলোর আলোচনাসহ অধিকারের দার্শনিক শ্রেণিবিভাগ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকারকে প্রধানত নৈতিক ও আইনগত অধিকারে বিভক্ত করে তার অন্তর্গত বিভাজন দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানবাধিকার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, অধিকারের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে দেখা যায় সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের অধিকার চেতনায় পরিবর্তন আসে এবং সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি ও কনভেনশন গঠন করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে মানবাধিকার আলোচনায় আইনের সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনের বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আইনের সাথে নৈতিকতা, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক থাকা বাঞ্চনীয়। কেননা মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত প্রত্যয় হলো আইন, স্বাধীনতা ও সমতা।

চতুর্থ অধ্যায়ে মানবাধিকার ব্যাখ্যায় নৈতিকতার সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রকারভেদ এবং নৈতিকতা সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকে সমকালীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিদার্শনিকের চিন্তা উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জন রলস ও রবার্ট নজিকের ন্যায় বিষয়ক অধিকারতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তার মীমাংসার পথ হিসেবে রলস বণ্টনমূলক ন্যায়ের কথা বলেন। আর নজিক ন্যায়ের স্বত্বতত্ত্ব হিসেবে স্বাধীনতাবাদী উদারনীতি উপস্থাপন করেন।

এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবাধিকারের বাস্তব অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাদের মানবাধিকারের দার্শনিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভে পরিশিষ্ট বাদে ৬ টি অধ্যায় রয়েছে। এগুলো ধারাবহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সূচীপত্র

ঘোষণাপত্র		i
প্রত্যয়নপত্র		ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iii
মুখবন্ধ		iv-v
সূচীপত্র		vi-viii

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা		১-১৯
১.১	মানবাধিকার: সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ	১-৭
১.২	মানবাধিকারের রাজনৈতিক ও দার্শনিক পটভূমি	৮-১১
১.৩	অধিকারের শ্রেণীবিভাগ	১২-১৬
	তথ্য নির্দেশ	১৭-১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবাধিকারের সূচনা ও মানবাধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারা		২০-৪২
২.১	মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের বিভিন্ন পেক্ষাপট	২০-২৬
২.২	অধিকারের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ	২৭-৩১
২.৩	বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা ও মানবাধিকার	৩২-৩৯
	তথ্য নির্দেশ	৪০-৪২

তৃতীয় অধ্যায়

মানবাধিকার আলোচনায় আইনের সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয়		৪৩-৭৯
৩.১	আইন: সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ	৪৩-৪৮
৩.২	আইন সম্পর্কে রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তা	৪৯-৫৮

৩.২.১ রোমক আইনতত্ত্ব ৪৯-৫০
৩.২.২ আইন ও আর্ন্তজাতিক আইন প্রসঙ্গে গ্রোসিয়াস ৫০-৫২
৩.২.৩ লকের আইনগত অধিকার ৫২-৫৪
৩.২.৪ রুশোর চিন্তায় আইন ৫৪-৫৬
৩.২.৫ হেগেলের আইনতত্ত্ব ৫৬-৫৮

৩.৩ আইনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক ৫৯-৬৬
৩.৩.১ প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ৬০-৬২
৩.৩.২ আইনগত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ৬২-৬৬

৩.৪ আইনের সাথে স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক ৬৭-৭৫
৩.৪.১ জন স্টুয়ার্ট মিল এর স্বাধীনতাতত্ত্ব ৬৯-৭০
৩.৪.২ আইন ও স্বাধীনতা ৭০-৭৩
৩.৪.৩ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমতার ধারণা ৭৩-৭৫
তথ্য নির্দেশ ৭৬-৭৯

চতুর্থ অধ্যায়

মানবাধিকার ব্যাখ্যায় নৈতিকতার স্বরূপ নির্ণয় ৮০-১১০
৪.১ নৈতিকতার ধারণা ৮০-৮৬
৪.১.১ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় ৮৩-৮৬

৪.২ নৈতিকতা বিষয়ক কতিপয় দার্শনিক চিন্তা ৮৭-৯৩
৪.২.১ প্লেটোর ধারণা ৮৭-৮৮
৪.২.২ এরিস্টটলের ধারণা ৮৮-৮৯
৪.২.৩ কান্টের ধারণা ৮৯-৯০
৪.২.৪ হেগেলের ধারণা ৯০-৯৩

৪.৩ রলসের ন্যায়তত্ত্বে অধিকারের ধারণা ৯৪-১০৩
৪.৪ রবার্ট নজিকের অধিকারতত্ত্ব ১০৪-১০৬
তথ্য নির্দেশ ১০৭-১১০

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার ১১১-১২৭
৫.১ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ১১১-১১৩
৫.২ আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি ১১৪-১১৭
৫.৩ আদিবাসীদের মানবাধিকার : দার্শনিক বিশ্লেষণ ১১৮-১২৬
তথ্য নির্দেশ ১২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার : মানবাধিকার বাস্তবায়নের তাৎপর্য ১২৮-১৪৬
৬.১ মানবাধিকার বাস্তবায়ন ১২৮-১৩০
৬.২ মানবাধিকার বাস্তবায়নের তাৎপর্য বিষয়ক মতের পর্যালোচনা ১৩১-১৩৯
৬.৩ মানবাধিকার বাস্তবায়ন কে বা কারা করবে? ১৪০-১৪২
৬.৪ মানবাধিকার বাস্তবায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ১৪৩-১৪৫
তথ্য নির্দেশ ১৪৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী

ইংরেজি গ্রন্থাবলী ১৪৭-১৫০
বাংলা গ্রন্থাবলী ১৫১-১৫২
সহায়ক প্রবন্ধ ও সাময়িকী ১৫২-১৫৩

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ মানবাধিকার সংজ্ঞা: ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

অধিকার হলো একটি সামাজিক ধারণা। মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজ থেকেই অধিকার ধারণাটির উদ্ভব। মানবাধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় 'অধিকার' প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ আবশ্যক। 'অধিকার'কে ব্যাপক অর্থে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে যে, অধিকার হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে বিশেষ সুবিধা আদায় অথবা সংরক্ষণ করার ন্যায্য দাবি এবং অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় ব্যক্তির নিজস্বার্থ রক্ষার জন্য, মানুষের সম্মান বা মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাই অধিকার সমুন্নত রাখা অপরিহার্য।

মানবাধিকার তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ কতগুলো অধিকার নিয়েই জন্মায় এবং সেসব অধিকার তার ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রথম ক্ষেত্রে রয়েছে জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হচ্ছে-অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা। তৃতীয় ক্ষেত্রে অধিকার হচ্ছে-শান্তি, উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তার অধিকার।

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মবিকাশের জন্য মানুষের প্রয়োজন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা। সাধারণভাবে এসব সুযোগ সুবিধাকে বলা হয় অধিকার। সেজন্য গিলক্রিষ্ট বলেন, "প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে চুড়ান্ত ভালো-য় পৌঁছতে পারে, সমাজবদ্ধ ব্যক্তির সমাজকর্তৃক স্বীকৃত এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে অধিকারের সৃষ্টি হয়।"[১] অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, "যে সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত করার অবস্থা সৃষ্টি করে সেগুলোই অধিকার।"[২] রাষ্ট্র সমাজের মানুষের পক্ষে আইনের মাধ্যমে এ অধিকারগুলোকে স্বীকৃতি দেয় এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অতএব, অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবি। আমরা অধিকারের প্রয়োজনবোধ করি নিজেদের জন্য, সমাজ রক্ষার জন্য এবং সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য। বার্কার (Barker) এর মতে, "অধিকার হলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেই সব সুযোগ-

সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত।"[৩] সুতরাং অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমস্টির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

অধিকার দুটো শর্ত যুক্ত

১। অধিকারযুক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে;

২। অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হতে হবে ।

অধ্যাপক বার্কারের মতে, যে সুযোগ-সুবিধা এ দুটো শর্তের একটিকে পূরণ করে না তা হলো আধা-অধিকার (quasi-right)। অধিকার হলো অলঙ্ঘ্য নৈতিক সক্ষমতা যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি কিছু করতে চায়, কিছু পেতে চায়, কিছু অর্জন বা ত্যাগ করতে চায়। বার্কার আরও বলেন, "অধিকারের মধ্যেই ব্যক্তির সামর্থ, পদর্মযাদা ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে এবং তা কার্যকর হয় রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা।"[৪] তাঁর মতে, তিনটি নীতির ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে অধিকার বণ্টন করে দেয়া হয়। নীতিগুলো হলো-

১। স্বাধীনতার নীতি,

২। সাম্যের নীতি ও

৩। ভ্রাতৃত্ব বা মৈত্রীর নীতি।

স্বাধীনতার নীতির অন্তর্ভুক্ত হলো- রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রভৃতি। আইন সভার নির্বাচনে যোগদান রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। শ্রমদানের সামর্থে মানুষ যে অধিকার লাভ করে তাই হলো তার অর্থনৈতিক অধিকার।

সাম্যের নীতি বলতে বোঝায়,

১। আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার,

২। আদালতে সমানাধিকার,

৩। করদান বিষয়ে সমানাধিকার ও

৪। সরকারি চাকরি লাভের সমানাধিকার।

ভ্রাতৃত্ব বা মৈত্রীর নীতি বলতে বার্কার বুঝিয়েছেন এমন কতগুলো অধিকারকে যেগুলো ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টা বা গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় লাভ করা যায়। এ অধিকারগুলো ভোগ করা সম্ভব সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে । যাতায়াতের সুযোগ, স্বাস্থ্যের সুযোগ, জাতীয় বীমা এ অধিকারের পর্যায়ভুক্ত।

অন্যকথায়, অধিকার হলো একটি ন্যায্য পাওনা এবং বৈধ ক্ষমতা যা একজন ব্যক্তি তার অবস্থান থেকে ভোগ বা ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ শক্তির দাবি করাই হলো অধিকার। এর মূল ভিত্তি হলো বৈধতা এবং নৈতিকতা । এক্ষেত্রে ব্যক্তির দাবি পূরণের ক্ষেত্রে কেউ বাধা প্রদান করবে না এটিই প্রত্যাশিত।[৫] মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাগুলো মানবাধিকার। মানবাধিকারকে এক কথায় 'সব ধরনের ভয় এবং অভাব থেকে মুক্তি' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

জাতিসংঘ মানবাধিকারের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে,"সর্বজনীন আইনি নিশ্চয়তা যা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিকে এমন সব কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে যেগুলো মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে ব্যাহত করে"। মানবাধিকারের কিছু মূলনীতি রয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদেই (অনুচ্ছেদ-১) এর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-'সকল মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং মর্যাদা ও অধিকারে সব মানুষ সমান।'

মানবাধিকার সর্বজনীন। একজন মানুষ যে দেশেরই নাগরিক হোন না কেন, যেখানেই বসবাস করুননা কেন, তিনি যে ধর্মের, বর্ণের, লিঙ্গের, জাতির বা ভাষার মানুষ হোন না কেন পৃথিবীর সব মানুষ সমভাবে সব মানবাধিকার ভোগ করার অধিকারী। এই অধিকারগুলো কোনো অবস্থাতেই কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কেউ স্বেচ্ছায় কোনো অধিকার ত্যাগও করতে পারেনা। মানবধিকার হিসেবে স্বীকৃত অধিকারগুলো অবিচ্ছেদ্য, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। একটি অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অন্য অধিকারকে যেমন এগিয়ে নেয় তেমনিভাবে এক অধিকারের লঙ্ঘন অন্য অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

মানবাধিকার বলতে বোঝায় মানুষের একান্ত কিছু চাহিদা যেগুলো থেকে মানুষ বঞ্চিত হলে তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা পদতলিত হয়। এটি মানুষের সেই সব একান্ত চাহিদা যেগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব, উদ্যমশীলতা ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একজন পরিপূর্ণ মানুষই সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। সুতরাং মানুষের মানবিক গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব অধিকার অপরিহার্য সেগুলোই মানবাধিকার নামে পরিচিত।

মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতা ভোগ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্থ, সাবলীল এবং আধুনিক জীবন যাত্রার জন্য অন্যতম নিয়ামক। মানুষ হিসাবে সমাজের বাসিন্দা হয়ে তাকে কিছু মৌলিক অধিকার ও সুযোগ পেতেই হয়, অন্যথায় সুস্থ নাগরিক জীবন বিঘ্নিত হয়, সভ্যতার সঠিক ধারণা বিনষ্ট হয়। সে কারণেই সভ্যতা এবং আধুনিকতা তথা জীবনযাপনের বর্তমান প্রণালীকে অর্থবহ এবং যথাযথ করার সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য জরুরী এক কর্তব্যরূপে বর্তায়। মানুষের সহজাত, সর্বজনীন, অলঙ্ঘনীয় অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারের মধ্যে পড়ে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নাগরিক অধিকারসমূহ। মুক্ত স্বাধীন পথ চলার অধিকার, বাক স্বাধীনতা, কর্ম সম্পাদনের অধিকার, শিক্ষা ও জাতীয়তা অর্জনের অধিকার, মানুষের সহজাত এই অধিকারসমূহই হলো মানবাধিকার।[৬]

মানবাধিকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে Wordnet এ বলা হয়েছে- মানবাধিকার (আইন) একটি অধিকার বা স্বাধীনতা যা সকল মানুষকে প্রদান করা হয় এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়াই অনুশীলন করা হয় (জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের মতো চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়): wordnet.Princeton.edu/perl/webwn, 10 December, 2012). ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'The Universal Declaration of Human Rights'- এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন গোত্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক অধিকারের অধিকারী যা মানবাধিকার নামে পরিচিত। রাষ্ট্র সকল জনগণের সর্বজনীন অহস্তান্তরযোগ্য মানবাধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য।[৭]

'মানবাধিকার'- এর শাব্দিক অর্থ মানবের বা মানুষের অধিকার। অর্থাৎ প্রতিটি মানব সন্তানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অধিকারসমূহ হচ্ছে মানবাধিকার। মানবাধিকার বলতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলোকে বোঝায়। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রতিটি মানব সন্তান হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে ক্রন্দন ধ্বনি উচ্চারনের মাধ্যমে তারা অধিকারের কথা ব্যক্ত করে, সমগ্র বিশ্বের কাছে তার অধিকারের কথা ঘোষণা করে।[৮] মানব সন্তানের এ অধিকারগুলোই তার মৌলিক অধিকার। এজন্য বলা হয় মৌলিক অধিকার হলো সেই অধিকার যেগুলো কোনোব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে ভোগ করে এবং যেগুলো নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত।[৯]

মানুষ জন্মসূত্রে চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে আসে। অতএব, মানবাধিকার বলতে সেই অধিকার বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যে অধিকার অর্জিত হলে মানুষ পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। সৃষ্টির সেরা মানুষ, আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।[১০]

গাজী শামছুর রহমান উল্লেখ করেছেন- মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে যেসব অধিকার তার থাকা আবশ্যক, সেসব অধিকারের নাম মানবাধিকার। মানুষের সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকাশ হতে দেওয়ার জন্য যেসব অধিকার থাকা আবশ্যক সেই সব অধিকারের নামও মানবাধিকার। আন্তর্জাতিকভাবে যেসব অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয়, নিজের দেশে সেগুলো মৌলিক অধিকার নামে চিহ্নিত করা হয়।[১১]

মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত বিষয় হচ্ছে মানুষ ও অধিকার। এ শব্দগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" বলেছেন প্রাচীন বাংলার কবি চন্ডিদাস।[১২] মানুষের অধিকারগুলো তার মর্যাদা ও মূল্যবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তার জন্মগত অধিকার। এগুলোকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়। UNO-এর Universal Declaration of Human Rights, 1948 এবং Preamable-এ এই প্রসঙ্গে বলা হয়-"মানব পরিবারের সকল সদস্যের মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি।"[১৩] অন্যভাবে উল্লেখ করা যায়, "মানবাধিকার অনেকাংশে সহজাত এবং প্রকৃতিগত অধিকার। এই অধিকারগুলো সম্পন্নকরণ, সংরক্ষণ বা উপভোগকরণ ছাড়া মানবাধিকারের ভিত্তি উপভোগ করা অসম্ভব"।[১৪]

১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের প্রকাশনা Human Rights: Questions and Answers- এ বলা হয়েছে-"মানবাধিকারকে সাধারণত আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত এমন কতগুলো অধিকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা ছাড়া আমরা মানবসত্তা হিসেবে বাঁচতে পারিনা"– মানবাধিকারের অর্থবোধ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করতে সমাজে সকলের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরনে দায়বদ্ধতা ও বিবেচনায় রাখতে হয়। Gearlirth Alan মানবাধিকার প্রসঙ্গে বলেন-"মানবাধিকারকে নৈতিক অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, যেখানে সহজভাবে সকল মানুষ সত্তা হিসেবে সমান। এসব অধিকার সর্বজনীন বৈধ নৈতিক নীতিমালা দ্বারা যুক্তিযুক্ত ও পরীক্ষিত।"[১৫]

মানবাধিকারের অর্থ মানুষের প্রয়োজন পূরণের সুবিধা প্রাপ্তির মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। "মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে তার অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশ সাধিত হয় এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হয় বলে মানবাধিকার এ সব প্রয়োজন পূরণের সুবিধা প্রাপ্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদিও মানুষের চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ তথাপি মানবীয় বুদ্ধি বিকাশের দিক হতে বিবেচনা করলে কতিপয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মৌলিক চাহিদা পূরণের মধ্যে এর একটি সাধারণ পরিচয় বিবৃত করা যায়। এতে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক চাহিদাগুলো হলোঃ (ক) জৈবিক চাহিদা-বস্তুগত (খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র ইত্যাদি); (খ) উৎপাদনশীল সৃজনা মূলক (কাজ করা ও সৃষ্টি করা); (গ) নিরাপত্তা (গোপনীয়তা রক্ষা করা ও নিরাপদ থাকা) এবং (ঘ) আধ্যাত্মিক (ধর্ম-কর্ম ও নিজ অস্তিত্বকে অর্থবহ রূপে খুঁজে নেয়া)।"[১৬] মানবাধিকার সম্পর্কে *The New Encyclopaedia Britannica*- তে বলা হয়েছে -"মানবাধিকার হলো প্রাকৃতিক আইনের আওতায় প্রাপ্য মানুষের অধিকার। এতে নারী-পুরুষ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিসত্তার মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে সমান অধিকারের প্রতি জাতিসংঘ সনদের মৌলিক আস্থা রয়েছে।"[১৭] মানবাধিকারকে একটি হাতিয়ার (Instrument) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হতে পারে। অপরদিকে মানবাধিকারের অস্বীকৃতি ও অস্বীকার সমাজ ও জাতির মধ্যে বৈষম্য, অত্যাচার ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।"[১৮]

মানবাধিকার সম্পর্কে বলা যায়, "মানবাধিকার হচ্ছে সেই অধিকার যা মানুষকে সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষকে বিশিষ্টতা প্রদানে সহায়তা করে; বলা যায় কারো মানবাধিকার হরণ করা হলে সে আর সুস্থ মানুষ থাকে না। গুটি কয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা মানুষের সহজাত, কোনো রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। সুতরাং রাষ্ট্র, সরকার কিংবা অন্য কোনো শক্তি মানুষের এ সব অধিকার যদি ছিনিয়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে ঐ মানুষের মানবাধিকারণ ছিনিয়ে নেয়া হয়, হরণ করা হয় মানুষের সহজাত মানবিক বৈশিষ্ট্য।"[১৯] অন্যভাবে বলা যায়, "মানবাধিকার ক্রমান্বয়ে সময়ের আবর্তে এবং মানবজাতির জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বিবর্তিত বা প্রকাশিত হয়, যাতে প্রত্যেক মানবসত্তার সহজাত মর্যাদা ও মূল্যের দ্বারা শ্রদ্ধা এবং নিরাপত্তা পেয়ে থাকে"।[২০] সমাজকর্ম অভিধানে বলা হয়েছে "মানবাধিকার হলো জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ বা ধর্মের কারণে পার্থক্য না করে সমাজের সকলের সমান অধিকার লাভের সুযোগ এবং সামাজিক পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সকলের দায়িত্ব পালনের সমতা।"[২১]

সুতরাং প্রকৃত অর্থে মানবাধিকার হলো স্বাভাবিক অধিকার ও প্রাকৃতিক অধিকারের সমন্বিত অবস্থা। যখন মানবাধিকার স্বাভাবিক অধিকার (স্বাধীনভাবে মতামত ও ভাব প্রকাশ) হিসেবে স্বীকৃতি পায় তখন সে তার প্রকৃত অধিকারকে অস্বীকার করে না। অন্যদিকে প্রকৃত অধিকার (দেশের সরকারি কার্যক্রম অংশগ্রহণ, জনসেবায় অংশগ্রহণ, নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি) দ্বারা যখন মানবাধিকারকে বোঝানো হয়, তখন নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক অধিকারের উপাদানগুলোকে স্বীকার করে নেয়া হয়। মানবাধিকার হলো এমন সব অধিকার যা ব্যতীত মানুষ সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে না। এ সব অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশ সংশ্লিষ্ট মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সুবিধা। এ সব অধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।[২২]

১.২: মানবাধিকারের রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি

Jack Donnelly[২৩] তাঁর *Universal Human Rights in Theory & Practice* গ্রন্থে মানবাধিকারের মুলউৎস খুঁজতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁর মতে, মানবাধিকার যদি কোনো সিদ্ধান্ত বা নিয়ম নীতির দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে তা এককেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। তাই তিনি বলেন, মানবাধিকারকে রক্ষা করতে গেলে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সমাজ স্বীকৃত চাহিদা বা নিয়ম-কানুন ছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকারকে বিশ্লেষণ না করে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতাকে বিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ সামাজিক পরিস্থিতি ঠিক করে দেয়ার জন্য কোনো ধরনের অধিকার থাকা উচিত এবং কে কীভাবে সেই অধিকার ভোগ করবে তারও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

Amartya Sen[২৪] *Human Rights and Asian Values* গ্রন্থে দেখান যে, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে মানবাধিকারের চর্চা হচ্ছে। কারণ সব দেশে গণতন্ত্র নেই অথবা গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সুযোগ সকলে সমানভাবে পায়না। যদিও জাতিসংঘের কাজ হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত সব দেশের মানুষের জন্য মানবাধিকার সংরক্ষিত করা এবং সুনিশ্চিত করা। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা তাদের যোগ্যতানুযায়ী কোনো কাজ পাচ্ছেনা। এমনকি তাদেরকে রাষ্ট্রের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখছে। সেন উল্লেখ করেন, এশীয় মূল্যবোধ মানুষের স্বাধীনতাকে কম মূল্য দেয়, বেশি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, বেশি রাষ্ট্রীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হয়। এখানে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান কর্তৃত্বমূলক। ফলে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তারা তাদের দলকে বা গোষ্ঠিকে বেশি সুবিধা দেয় কিন্তু বাকীদের বঞ্চিত করে। তিনি চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, কোষ্টারিকা, জ্যামাইকা, সিঙ্গাপুরসহ অনেক আফ্রিকান দেশের উদাহরণ তুলে ধরেন।

চারটি মুখ্য দিক নিয়ে মানবাধিকারের ধারণা গঠিত- মৌলিক মানবীয় মর্যাদা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক সংহতির অধিকার। প্রথমটিতে আছে বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন, ঐতিহ্যের সম্পৃক্ততা, দ্বিতীয়টিতে জন লকের উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রভাব, তৃতীয়টিতে পরিবর্তনশীল সমাজে উদ্ভূত চাহিদা মোকাবিলার তাড়নাগত চিন্তা-চেতনা এবং শেষোক্তটিতে আছে বৈশ্বিক সমস্যায় নৈতিক দায়িত্ববোধের ধ্যান-ধারণা।

প্রাকৃতিক তথা ঐশী আইনের আওতায় মানুষের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শোভন আচরণের আবশ্যকতা একটি প্রাচীন ধারণা। এই ধারণা লক ও জেফারসনের মত তাত্ত্বিকদের লেখায় স্বাভাবিক অধিকার এবং সেই সাথে মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সংক্রান্ত ফরাসী ঘোষণা এবং মার্কিন অধিকার বিলের মতো অধিকার ঘোষণার সাথে এই ধারণার মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে[২৫]। সহজভাবে, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র ও ফ্রান্সের নাগরিক অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে বর্তমান মানবাধিকার ধারণার সূত্রপাত বলে বিবেচিত হয় তথাপি এর অনেক বিষয় ও উপাদানাদির স্বীকৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনে লক্ষ্য করা যায়। ফলে মানবাধিকারের দর্শনগত ভিত্তি সে সব ক্ষেত্রে খুঁজে দেখা প্রয়োজন হয়।[২৬]

তবে এক্ষেত্রে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও চুক্তিগুলো যদি সমকালীন ধারণার পরিচয়বাহী হিসেবে দেখা হয় তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধারণার সাথে পার্থক্য হলো আজকের মানবাধিকারের ধারণাগত বিকাশে ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব যা-ই থাকুক না কেন মানবাধিকার মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি, স্বাধীনতা ও মৌলিক স্বার্থ বিষয়ক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অধিকার বিষয়ক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসবোধ, মূল্যবোধ ও সুসংহত অনুভব উপলব্ধি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়।

মানবাধিকারের দার্শনিক দিক বা মূল্যবোধ চিহ্নিত করতে বাস্তবে যদিও সমাজের নানাবিধ দিক গভীরতর অধ্যয়নের আবশ্যকতা আছে তথাপি কতিপয় সাধারণ দর্শনগত ভিত্তি ও মূল্যবোধ মানবাধিকারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রূপায়ণ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো মানবাধিকার এসব দার্শনিক ভিত্তি ও মূল্যবোধ সমাজকর্মের সেবা সহায়তার সাথে সংগতিপূর্ণ। ফলে সামজকর্ম অনুশীলন মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও বিকাশে প্রত্যক্ষ অবদান রাখে। মানবাধিকারের মূল্যবোধ বা দার্শনিক ভিত্তিসমূহ আলোকপাত করা হলোঃ-

১. জীবনের মূল্য (Value of life) সকল মানবাধিকারের ক্ষেত্রে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জীবনের অর্থবহতা শুধু জীবন বিরোধী অবস্থাকে প্রতিহত করে না, ইতিবাচক ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়। এসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভ মানুষের জন্মগত অধিকার। জীবনের পরম মূল্য মানবাধিকারের ভিত্তিভূমি।

২. মানব মর্যাদা মানবাধিকারের একটি মৌলিক দর্শন। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, একই মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে সকলের জন্মগত সমতা ও অভিন্ন মর্যাদাই হলো "স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও শান্তির ভিত্তি"। মানবাধিকারের ভিত্তি হলো মানব মর্যাদা, মানব মর্যাদা সকল নৈতিক নীতির উৎস।[২৭]

৩. স্বাধীনতা ও মুক্তি মানবাধিকারের অপর একটি দার্শনিক ভিত্তি। মানবাধিকারে রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ সমান ও স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। তাদের রয়েছে বিবেক ও যুক্তিবাদী মনন এবং তারা একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদ, সকল মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে- এ নীতিটিকে ধারণ করা হয়েছে। আত্মরক্ষা সম্পর্কিত অধিকার ও ন্যায়ভিত্তিক। অধিকার নির্দিষ্ট করতে আইনের প্রয়োজন হয়, অধিকার অনেক সময় দায়িত্বও নির্দেশ করে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা নির্দিষ্ট করতে আইন বা প্রথাগত নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট। স্বাধীনতা আত্মসম্পর্কিত অনেক (কিছু) হলেও মূলত কর্মের অধিকারকে (Rights of Action) বুঝিয়ে থাকে এবং এ কর্মের অধিকারের অধিকন্তু রয়েছে স্বাধীনতার অধিকার (Rights to liberty)। আর কর্ম সম্পর্কিত স্বাধীনতা, কেবল অনুমতি দায়ক স্বাধীনতা । কর্মের অধিকার বলতে অস্তিবাচক অর্থে আর্থ-সামাজিক পরিসরে কর্মগ্রহণ ও সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টিকে বুঝিয়ে থাকে।[২৮]

৪. মানবাধিকারের দার্শনিক তাৎপর্য মানবীয় মর্যাদা ও বিকাশের দিককে প্রতিফলিত করে। কারণ, প্রত্যেকে মুক্তভাবে জন্ম নেয়ার স্বাধীনতার অধিকার পেতে পারে বলে তার জীবনাচরণে পছন্দের স্বাধীনতা রয়েছে। স্বাধীনতা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মূল্য নির্দেশ করে যা মানবীয় জীবনের অর্থবহতা ও মর্যাদার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৫. মানবাধিকারের সবচেয়ে মূল্যবান দর্শনগত ভিত্তি হলো সমতা ও বৈষম্যহীনতা। ধর্মীয় আদর্শ ও দার্শনিক চিন্তা, অধিকার সংরক্ষণমূলক বিধিব্যবস্থা বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে গৃহীত মানুষ ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত সনদে বলা হয়েছে যে, মানুষ অধিকারের ব্যাপারে জন্মগতভাবে সমান এবং এ সাম্য আচরণ বজায় থাকবে। সমসাময়িক মানবাধিকার দলিলগুলোতে সমতাবাদ অত্যন্ত দৃষ্টিগোচর বিষয়। প্রথমতঃ এই দলিলগুলোতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ও রক্ষা ব্যবস্থা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার ওপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সমসাময়িক

কালের মানবাধিকার দলিলগুলোর সমতাবাদী বৈশিষ্ট্য এর কল্যাণ অধিকারগুলোর অন্তর্ভুক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সমতার নীতিটি ব্যক্তি বা দলের মধ্যকার বৈষম্যর অবসান ঘটাতে সক্ষম। সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিকে বিশেষভাবে লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সমতা আনার প্রয়োজন হয়। বৈষম্য মানুষের কাজের ক্ষেত্র, মান মর্যাদা ও মত প্রকাশকে সংকুচিত করে। বৈষম্যের অবসান মানুষের জন্য মৌলিক ও সর্বজনীনভাবে গৃহীত।

৬. ন্যায়বিচার মানবাধিকার দর্শনের মূল ভিত্তি। ন্যায়বিচারের ধারণা সমতার ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলেও এবং সমমর্যাদা প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করলেও তাতে মানুষের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রসঙ্গে এর নীতিমালারূপে স্বীকৃত হবার দাবি রাখে। এতে ন্যায়বিচারে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক স্বার্থরক্ষার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত হয়। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ধারণা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে বিবেচনায় আসে। এতে আইনগত, বিচারগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিকও রয়েছে। এসব দিক সমাজের সদস্যদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার ভিত্তি গড়ে তোলে এবং মানুষের মধ্যে সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৭. সামাজিক দায়িত্ব মানবাধিকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতার বাইরেও সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব পায়। সাধারণভাবে এটি সর্বজনগ্রাহ্য মত যে, অধিকারের সঙ্গে স্বার্থ বা স্বার্থ সংরক্ষণের একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। এছাড়া অধিকারের সঙ্গে দায়িত্বের ও দায়বদ্ধতার সম্পর্ক রয়েছে, যদিও এটি সবক্ষেত্রে পরিস্ফুট নয়। অধিকাংশ ধর্ম ও দর্শনে এরূপ সামাজিক দায়িত্ব জোরালোভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সামাজিক দায়িত্বের তাৎপর্য ও অর্থবোধ যেভাবেই চিহ্নিত করা হোক না এটি মানবাধিকারের দর্শনে গভীরভাবে প্রোথিত।

বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গসহ অন্যান্য কোনো কিছু বিবেচনা না করে ব্যক্তিত্ব এবং মানুষের পরিপূর্ণ সম্ভবানার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হলো মানবাধিকার দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়। এটিই মানবাধিকার দর্শনের প্রকৃত তাৎপয। কাজেই মানবীয় সম্পর্কের বিবর্তন, শান্তি ও অসহিংসতার দাবি হিসেবে মানবাধিকারের আবেদন কার্যকর করতে জনসচেতনতা ও দায়িত্ববোধের জাগরণ আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

১.৩ অধিকারের শ্রেণীবিভাগঃ

অধিকারের যৌক্তিক কাঠামোটি (logical structure) আলোচনার পূর্বে আমাদের আইনগত অধিকার (legal or positive rights) এবং নৈতিক অধিকারের (moral or human rights) পার্থক্য জানতে হবে। আইনগত অধিকার হলো সেসব অধিকার যেগুলো কিছু আইনানুগ অথবা প্রথাগত অনুশীলনের কারণে ব্যক্তি সমাজে থেকে লাভ করে।[২৯] উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির নিজের দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার থাকে কিন্তু অন্য দেশে নয়। প্রত্যেক দেশের আইনি নীতিমালাসমূহ অধিকার গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ হতে পারে। অন্যদিকে নৈতিক বা মানবাধিকারগুলো নৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হওয়ার ব্যাপারে কম নির্ণয়সাধ্য যেমন, এটি একজন ব্যক্তির নৈতিক অধিকার যে, অন্যের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত না হওয়া। অধিকারের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেসব নিয়ম প্রক্রিয়া নিযুক্ত তাদের ওপরই আইনগত ও নৈতিক অধিকারের মূল পার্থক্য নির্ভর করে। আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ আইনি অথবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে নৈতিক অধিকার বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক যুক্তি তুলে ধরা হয়।[৩০]

মানুষের কিছু স্বাভাবিক অধিকার (Natural rights) রয়েছে, যা নৈতিক অধিকার হিসেবে পরিচিত। নৈতিক অধিকারকে আবার সহজাত বা প্রাকৃতিক অধিকার বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক অধিকার প্রকৃতি কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎসারিত ও নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ন্যায়পরতা, সততা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ইত্যাদি থেকে নৈতিক অধিকার উৎসারিত। অপরদিকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আইনগত অধিকারের ভিত্তি স্থাপিত। এই অধিকারের বিকাশ ঘটেছে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানবজাতিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করার মধ্য দিয়ে। এটি মানুষের জন্য, মানুষের সম্মতিতে, মানুষের দ্বারা প্রণীত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

Hohfeld[৩১] (1919) অধিকারের শ্রেণীকরণ করেন, যা আইনগত অধিকারের বিভিন্নরূপের চিরায়ত বিশ্লেষণ হিসেবে বিবেচিত। তিনি অধিকারকে চারভাগে ভাগ করেন: দাবির অধিকার (Claim-rights), স্বাধীনতার অধিকার (Liberty-rights), ক্ষমতার অধিকার (Power-rights), এবং নিরাপত্তার অধিকার (Immunity-rights).

দাবির অধিকার (Claim-rights)- এ অধিকারগুলো অন্যের ওপর দাবির ভিত্তিতে গঠিত, যার ফলে এগুলো সবসময় অন্যের সাথে যুক্ত। যেমন, `A' ব্যক্তি যদি `B' ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা ধার করে, তাহলে `A' এর অধিকার থাকে `B' এর কাছ থেকে টাকা ফিরে পাবার। আর `B' এর অনুরূপ দায়িত্ব থাকে টাকাটা `A' কে ফিরিয়ে দেওয়ার। Hohfeld এ অধিকারকে এর 'কঠোর দৃষ্টিকোণ' থেকে দেখিয়েছেন, যদিও একে প্রায়ই এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, এগুলো অন্যের ওপর দাবিযুক্ত থাকে এবং পারস্পরিক দায়িত্ব চাপানো হয় যাতে অধিকার সুরক্ষিত করার মাধ্যমে নীতিটিকে নিশ্চিত করা যায়।

স্বাধীনতার অধিকার (Liberty-rights)- এ অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেউ অন্যদের প্রতি আইনগত বা নীতিগতভাবে কোনো দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়। যেমন, যদি দুজন ব্যক্তি একটি জমি ক্রয়ের চেষ্টা চালায়, তাহলে প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকে এটি ক্রয় করার কিন্তু কারো আইনগত ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা থাকে না অন্যকে তা করতে সম্মতি দেওয়ার।

ক্ষমতার অধিকার (Power-rights)- ক্ষমতাকে সাধারণত আইনগত সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্য আইনগত সক্ষমতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এভাবে ক্ষমতার অধিকার প্রায় ক্ষেত্রে ক্ষমতার পরিবর্তনে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, উইল তৈরি করার অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার- এসব ক্ষেত্রে ক্ষমতা আইনগতভাবে গঠিত হয়। এখানে প্রতিটি অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কিছু লেনদেন ফলপ্রসূ করার জন্য আইনগত অধিকারের সাথে যুক্ত।

নিরাপত্তার অধিকার (Immunity-rights)- এ অধিকারটি অন্যদের ক্ষমতার অধীন নয়, নিরাপত্তার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যদের ক্ষমতা থেকে মুক্ত। যেমন, একটি সমাজে যেখানে তালাকের জন্য কোনো আইনগত শর্ত থাকে না সেখানে একজন ব্যক্তি তার স্বামী/স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা থেকে মুক্ত অন্য কথায়, ব্যক্তির অধিকার আছে তার স্বামী/স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত না হওয়ার, এক্ষেত্রে তাদের তালাক প্রদানের ক্ষমতা থাকে না। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতা (Power) এবং নিরাপত্তা (Immunities) দুটো বিষয়ই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অন্যের প্রতি অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য সক্ষমতার গুরুত্ব বহন করে।

Hohfeld কর্তৃক অধিকারের উপর্যুক্ত শ্রেণীকরণ ছাড়াও দেখা যায় যে, অধিকার সাধারনত পাঁচটি মূল উপাদানের ধারণার সমষ্টিঃ[৩২] (i) অধিকার ভোগের জন্য কর্তা থাকবে, যা ব্যক্তি দল, জাতি,

রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, এমনকি সমগ্র বিশ্ব হতে পারে। (ii) অধিকারের বিষয়বস্তু, যা অধিকার হিসেবে একজন অধিকার ভোগী (right holder) দাবি করতে পারে। (iii) অধিকার চর্চাকরণ, এ কাজটির মাধ্যমে অধিকার ভোগী (Subject) বিষয়বস্তু (Object)-র সাথে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হয়। এ ধরনের চর্চা কিছু ব্যক্তি, দলের বিপক্ষে হতে পারে। (iv) অধিকার, কিছু ক্ষেত্র ছাড়া কারো বিপক্ষে ধরে নেয়া হয় এবং বৈশিষ্ট্যগতভাবে কর্তব্য দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। (v) সবশেষে, অধিকারের যৌক্তিকতার প্রশ্ন আসে। একটি অধিকার তখনই যৌক্তিক হবে যখন তা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

অধিকারের শ্রেণীবিভাজনের প্রশ্নে রাষ্ট্রদার্শনিকগণ ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। বার্কার অধিকারকে স্বাধীনতা, সাম্য ও সহযোগিতা বা সৌভ্রাতৃত্ব-[৩৩] এই তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক ল্যাস্কি অধিকারকে 'সাধারণ' (general) এবং নির্দিষ্ট (particular) [৩৪] এই দুইভাগে ভাগ করার পক্ষে। ব্যাপক অর্থে আমরা অধিকারকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি: ক) নৈতিক অধিকার এবং খ) আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকার সমূহকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়: যথা ১. পৌর অধিকার (Civil rights) ২. রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights), ৩. অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) ৪. সামাজিক অধিকার (Social Rights)। অধিকারের এ শ্রেনীবিভাজনকে J.C Johari[৩৫] নিম্মোক্তভাবে তুলে ধরেছেন:

১. নৈতিক অধিকার (Moral Rights)- সামাজিক ন্যায়নীতিবোধের ওপর ভিত্তি করে যেসব অধিকার গড়ে ওঠে, সেগুলোকে নৈতিক অধিকার বলে। এসব অধিকার ভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্র কোনোরূপ শাস্তি বিধান করতে পারে না। নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারী কেবল নিজ বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়। যেমন-বার্ধক্যে সন্তানের ওপর পিতা-মাতার ভরণ পোষণের দাবি, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধালাভের দাবি প্রভৃতি নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকার ক্ষুন্ন হলে রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারে না।

২. রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)- রাজনৈতিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ বোঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই হলো সার্বভৌম। তাই জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা অসম্ভব। গ্যাটেলের মতে,"রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আইনি অভিব্যক্তি ও প্রশাসনে অংশগ্রহণের অনুমতি লাভই হলো রাজনৈতিক অধিকার।"[৩৬] রাজনৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে নির্বাচন করার অধিকার বা ভোটাধিকার, নির্বাচিত

হওয়ার অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি লাভের অধিকার, সরকারের কাছে আবেদন করার অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩. **পৌর অধিকার (Civil Rights)-** এ অধিকারগুলো ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির সাথে জড়িত। যে সব সুযোগ সুবিধা ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সভ্য সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। সেগুলোকে পৌর বা সামাজিক অধিকার বলে। এসব অত্যাবশ্যকীয় অধিকারগুলো ছাড়া জীবন ধারণ বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব। সামাজিক অধিকারসমূহের মধ্যে জীবন ধারনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মাচারণের অধিকার, স্বাধীন গতিবিধির অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুসভ্য সামাজিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলে সভ্য রাষ্ট্র মাত্রই এসব অধিকারকে স্বীকার করে নেয় ও আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৪. **অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)-** জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ থেকে মুক্তিকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। ল্যাস্কির মতানুসারে অর্থনৈতিক অধিকার বলতে,"...প্রাত্যহিক অন্ন সংস্থানের প্রয়োজনীয় অর্থ খুঁজে পাওয়ার সুযোগকে বোঝায়"।[৩৭] কর্মের অধিকার, উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, অবকাশ বিনোদনের অধিকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার। এসব অধিকার ব্যতিরেকে ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক অধিকার না থাকলে ব্যক্তি তার ব্যক্তি সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, মানবাধিকার হচ্ছে একসময়ের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে যা পরিচিত তারই পরিমার্জিত রূপ। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং মানবাধিকার কমিশনের দ্বারা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বিশেষ কিছু নাগরিক অধিকার (civil rights) কে একত্রিত করে মানবাধিকার রূপলাভ করে। এই ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয়, "যেহেতু, মানব পরিবারের সকল সদস্যের মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার বিশ্বশান্তির ভিত্তি:... যেহেতু, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরূদ্ধে মানুষকে যাতে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করতে না হয় সেজন্য আইনের অনুশাসন দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য... মানবাধিকারের এই সর্বজনীন ঘোষণাকে সকল জনগোষ্ঠীর এবং সকল জাতির জন্য অভীষ্ট সাধারণ মান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করছে, যাতে সকল সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি অংশ এই ঘোষণাকে

সর্বদা মনে রেখে অধ্যাপনা ও শিক্ষার মাধ্যমে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলো জনগোষ্ঠীসমূহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনাধীন ভূখন্ডের জনগণের মধ্যে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বজনীন এবং কার্যকরী স্বীকৃতি একং প্রতিপালন নিশ্চিত করতে প্রয়াস পায়।''[৩৮] এই ঘোষণাপত্রটি মূলত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন নৈতিক বা প্রাকৃতিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারের সমন্বিতরূপ।

অধিকারের বিভিন্নরূপ (নৈতিক, পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা মানবাধিকার)- এর বিতর্কের পাশাপাশি মৌলিক অধিকারের সাথে যুক্ত হয়েছে। এ কারণে চিন্তাবিদদের মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উদারপন্থীগণ রাজনৈতিক অধিকারকে গুরুত্ব দেন, যা চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে যুক্ত। মার্কসবাদীরা কাজ ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার হিসেবে অর্থনৈতিক অধিকারকে গুরুত্ব দেন। সুতরাং একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারত যেখানে তার সংবিধানে সমতা ও স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় সেখানে সোভিয়েত ও চীনা সংবিধানে কাজের অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

তথ্য নির্দেশ

১. V.D. Mahajan, *Political Theroy*, (New Delhi: S.Chand & Company Ltd.1988), p.319.

২. *Ibid*. p.316.

৩. Barker, E., *Principles of Social and Political Theory*, (London: Oxford University Press, 1967), p.226.

৪. *Ibid*. p.228.

৫. Noel and Rita Timms, *Dictionary of Social Welfare*, (Routledge & Kegan Paul, Great Britain, 1977), p.165.

৬. *মানবাধিকার সনদ*, ১৯৪৮

৭. Forum for the Human Rights, Finland

৮. মাহবুল-উল-হক জোয়ার্দ্দার, *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ.১৩.

৯. মোঃ নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার ও সমাজ কর্ম*, (নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৫), পৃ.১২.

১০. গাজী শামসুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪) পৃ.৪.

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২.

১২. তিনি তাঁর মনসা মঙ্গল কাব্যে এ বক্তব্য তুলে ধরেন ।

১৩. Moskowity Moses, *Human Rights and World Order*, (New York: Occan Publications Inc, 1999), p.19.

১৪. Begum Rokeya, "Human Rights-An Overview in Historical Perspective". *The Journal of Social Development* , Vol.12, no .1, Dec -1997, p.185.

১৫. Alan Gealirth, *Human Rights: Essays on Justification Applacations* , (Chicago University Press, 1982), p.1.

১৬. *Encyclopaedia of Social Work*, (NASW Press, Washington, D.C Vol. 2, 1995), p.79.

১৭. *The New Enclopaedia Britannica* (1978), Vol-2, p.200.

১৮. Begum Rokeya, "Human Rights –An Overview in Historical Persective" *The Journal of Social Development* , Vol.12, No.1, Dec-1997, p.24.

১৯. মোস্তাফাজামান ভুট্রো, *Amity –A Voice of Humanity*, Vol-1,(University Press Limited, Dhaka, 2002), p.1.

২০. Muhammad Zamir, *Human Rights: Issue and International Law*, (University Press Limited, Dhaka, 1990), p.1.

২১. *The Social Work Dictionary*, 3rd ed, NASW Press, Washington, D.C, p.173.

২২. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম ও লুৎফর রহমান, *মানবাধিকার: সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ*, (নভেল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৫), পৃ.১৬.

২৩. J. Donnelly, *Universal Human Rights in Theory & Prictice*, 2nd ed. (Ithaca & London: Cornell University Press, 2003), p.167.

২৪. Amartya. Sen, *Human Rights and Asia Values*, *(*লেখক ১মে, ১৯৯৭ তারিখে নিউইয়র্কে আয়োজিত এক কনফারেন্সে 'নৈতিকতা ও বৈদেশিক নীতি' বিষয়ে বক্তব্যে উপস্থাপন করেন।).

২৫. জেমস ডব্লিউ নিকেল, অনুবাদ- আফতাব হোসেন, *মানবাধিকারের তাৎপর্য*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ৫৬.

২৬. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ*, (রোহেল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৫) পৃ.২৮.

২৭. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম ও লুৎফর রহমান, *মানবাধিকার: সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ*, (নভেল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৫), পৃষ্ঠা-১৬.

২৮. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, (১৯৯৯), *মানবাধিকার: অন্ধকার থেকে আলোর পথে*, পৃষ্ঠা-৪৩.

২৯. N.Haque, *Applied Philosophy*, (Jatoya Sahitya Prakash, Dhaka, 2015), p.12.

৩০. *Ibid*., p.12.

৩১. W.N. Hohfeld., *Fundamentals legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, (New Heaven: Yale University Press, 1999), p.186.

৩২. N. Haque, *Applied Philosophy*, p.13.

৩৩. E. Barker, *Principles of social and political Theroy* (London: Oxford University Press, 1967), p. 228-235.

৩৪. H. Laski, *A Grammer of Politics* (London: George Allen & Unwin Ltd. 1937), p.91.

৩৫. J. C. Johari, *Contemporary Political Theory*, Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.193.

৩৬. R.G.Gettell, *History of Political Thought*, (London: George Allen & Unwin Ltd.1932), p.140.

৩৭. *Ibid*., Laski, H., *A Grammar of Politics*, p.93.

৩৮. *মানবাধিকার সনদ*, ১৯৪৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবাধিকারের সূচনা ও মানবাধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারা

২.১: মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট

"মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা যে ভিত্তি প্রদান করে তা মানব স্বাধীনতার রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর অবস্থিত। মানুষের এই স্বাধীনতা অর্জন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির সামর্থ বা ইচ্ছা সৃষ্টি করে। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাফল্য সেই সত্য ভিত্তিই প্রদান করে''। *Journal of United Nations and Human Rights*- এ বর্ণিত জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব উথান্ট এর এ উক্তি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই মূলত মানবাধিকারের উদ্ভব। তবে বর্তমানে মানবাধিকারের এই প্রতিষ্ঠিত রূপ একদিনেই সম্ভব হয়নি, বরং এটি অর্জিত হয়েছে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৃথিবীর বহু মনীষীর সমন্বিত চিন্তা চেতনার ফলে।[১]

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে Universal Declaration of Human Rights যা বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করার মানসে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং এ ধারণাটি সমগ্র বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করে।

ক্ল্যাসিক্যাল যুগ, মধ্যযুগ ও রেঁনেসার যুগের বিভিন্ন দার্শনিক যেমন ফ্রান্সের Bodin ও Jean Jacqus Rousseau, ইতালীর Hugo Grotius, ইংল্যান্ডের Sattel, John Locke ও Blackston, জার্মানীর Karl Marx প্রমুখের লেখা থেকে মানবাধিকারের ধারণা পাওয়া যায়। এরা প্রত্যক্ষ করেন যে, মানুষ হিসেবে প্রত্যেকে কতগুলো প্রাকৃতিক অধিকার লাভ করে থাকে। পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ যখন স্বৈরশাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে থাকে এবং স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ কর্তৃক তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হতে থাকে তখন উপর্যুক্ত দার্শনিকগণের চিন্তাধারার আলোকে বিপ্লবের নায়কগণ বিভিন্ন দেশে Charters, Bills, Petitions ও Declarations প্রণয়ন করেন, যেগুলোতে মানুষের জন্য কতগুলো ন্যূনতম নাগরিক অধিকার বা দাবি স্থান লাভ করে। মানবাধিকারের এ সকল দলিল প্রণীত হওয়ার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়।[২]

ক) বৃটিশ প্রেক্ষাপট

ইংল্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকার কারণে সেই সময়ে সেখানে মূলত মানুষের মৌলিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। কেননা, পূর্বে মনে করা হতো যে, মানুষকে অধিকার দেয়া বা না দেয়া রাজার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। কিন্তু কালক্রমে রাজার এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা জনগণের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের কারণে অস্তমিত হয় এবং সেখানে জনগণের সরকার কায়েম হয় এবং মানুষ বিভিন্ন দাবির মাধ্যমে রাজার নিকট থেকে এদের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অধিকারগুলো আদায় করতে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে জন্ম নেয় মানুষের অধিকার সংক্রান্ত বিল। এ বিলের মধ্যে প্রথমে আসে ১২১৫ সালের 'ম্যাগনা কার্টা।[৩]

(ক) ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা: ইংল্যান্ডে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পিছনে যে দলিলটিকে সর্বপ্রথম চিহ্নিত করা হয়, তা হচ্ছে ১২১৫ সালের 'ম্যাগনা কার্টা'। এই ম্যাগনা কার্টার ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে জেলে বন্ধী রাখা যাবে না, তার ওপর কর আরোপ করা যাবে না, যদি এই ব্যবস্থা পিয়ারদের দ্বারা গৃহীত না হয়। এই সনদে চার্চকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং জনগণকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ও দ্রুত বিচার নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজকীয় অফিসারদের দ্বারা স্বেচ্ছাচারীভাবে কর আরোপ এবং সম্পত্তি আটক বা দখলের বিধান রহিত করা হয়। এই সনদে বিধান রাখা হয় যে আইনের যথাযথ পদ্ধতি ছাড়া কাউকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ম্যাগনা কার্টার মাধ্যমেই জুরীর সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা এবং হেবিয়াস কার্পাস রীট সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়। সর্বোপরি বলা যায়, ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টাই ইংলিশ আইনে সর্বপ্রথম ব্যক্তি স্বাধীনতা বা Personal liberty প্রবর্তন করে এবং এ সনদকে 'Deystone of English liberty' বলেও অভিহিত করা যায়। ম্যাগনা কার্টা ইংল্যান্ডে রাজা জন কর্তৃক ১২১৫ সালে গৃহীত হয় এবং ১৫৫৪ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড কর্তৃক তার সংশোধনী আনা হয়।

(খ) ১৬২৮ সালের 'পিটিশন অব রাইটস: ইংল্যান্ডে ম্যাগনা কার্টা গৃহীত কবার পর পরবর্তী মানবাধিকার বিষয়ক দলিল হলো 'পিটিশন অব রাইটস'। এটি ছিল পার্লামেন্টের মাধ্যমে প্রণীত একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা। রাজা কর্তৃক প্রত্যাখাত হবার সন্দেহে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিল আকারের গৃহীত হয়নি বলে এটিকে 'Petition of Revolution' (1640-1647) হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। এর চারটি ধারা ছিল এগুলো হলোঃ-

১. পার্লামেন্টের অনুমতি ব্যতীত কোনোব্যক্তির ওপর করারোপ করা যাবে না;

২. কারণ না দেখিয়ে কাউকে জেলে আটক রাখা যাবে না;

৩. সেনাবাহিনীর কোনো দল গৃহকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কারো গৃহে অবস্থান করতে পারবে না;

৪. রাজা বা রাণী কর্তৃক সামরিক আইনে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশন জারী করা যাবে না।

(গ) 'বিল অব রাইটস' ১৬৮৮: পিটিশন অব রাইটস এর পরে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে ১৬৮৮ সালের বিল অব রাইট। এ বিল দ্বারা রাজার কোনো আইনকে স্থগিতকরণ ও সাময়িকভাবে রহিতকরণের ক্ষমতাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত শুধুমাত্র রাজকীয় বিশেষাধিকার বলে কর আরোপের বিধানকেও বাতিল করা হয়। বিল অব রাইটস দ্বারা রাজা বা রাণী কর্তৃক স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজকীয় কমিশন বা আদালত গঠন সংক্রান্ত রাজকীয় ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত স্থায়ীভাবে শান্তির সময়ে সেনাবাহিনী গঠনকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এই বিল দ্বারা রাজার নিকট প্রজাদের আবেদন করার অধিকার সৃষ্টি হয় এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের পার্লামেন্টে কথা বলার এবং বিতর্কে অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এ বিল ইংল্যান্ডের সাংবিধানিক আইনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং এ দলিলের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানবলী সংযোজিত হয়েছে।

ইংল্যান্ডের 'The Petition of Right of 1628' এবং 'The Bill of Rights of 1689' এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল ফরাসী বিপব (French Revolution) এবং আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার ওপর।

(ঘ) ১৭০১ সালের 'এ্যাকট অব সেটেলমেন্ট': বৃটেনের জনগণের মানবাধিকার উত্তরণের পরবর্তী দলিল হচ্ছে ১৭০১ সালের 'এ্যাকট অব সেটেলমেন্ট'। এই দলিল দ্বারা সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্ধারণের পাশাপাশি ১৬৮৯ সালের 'বিল অব রাইটস'-এ বর্ণিত কতিপয় অধিকারের পরিপূরক কিছু বিধান রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। 'বিল অব রাইটস' এবং 'এ্যাকট অব সেটেলমেন্ট' একত্রে 'Victory of Parliament' হিসেবেও চিহ্নিত হয়।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বৃটেনে মানবাধিকারের উন্নয়ন পর্যায়ক্রমে ও ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়েছে। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে যখনই সীমিত

করার চেষ্টা করা হয়েছে, ঠিক তখনই জনগণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে রাজা ও জনগণের মধ্যে আপোষকামীতার ফসল হিসেবে 'অধিকার' নামক সহজাত ও প্রাকৃতিক ধারণার। বৃটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার উন্নয়ন কীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে আইভর জেনিংস মন্তব্য করেন- 'আইন ও প্রতিষ্ঠান নয় বরং স্বাধীন মানুষের আত্মার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতার উৎস নিহিত। এটা ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বাধীনতা শক্তির স্বাধীনতা যা চার্চ দ্বারা সীমিত স্বাধীনতা, নিরুঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বা পার্লামেন্টারী স্বাধীনতা। যার ফলে স্বাধীনতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।'

যদিও ইংল্যান্ডে কোনো লিখিত সংবিধান তথা কোনো সুনির্দিষ্ট বিল অব রাইটস নেই, তথাপি সেখানে বিদ্যমান 'ম্যাগনা কার্টা', 'পিটিশন অব রাইটস', 'বিল অব রাইটস' এবং 'এ্যাকট অব সেটেলমেন্ট' বিদ্যমান থাকায় এগুলো বৃটেনের জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এ সনদগুলো শুধু ইংল্যান্ডে নয়, সারা বিশ্বে মানবাধিকার বিকাশে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করে।[৪]

খ) মার্কিন প্রেক্ষাপট

আমেরিকায় মানবাধিকার বিকাশে দুটি মুখ্য উদ্যোগ হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৭৭৬) এবং আমেরিকার বিল অব রাইটস (১৭৯১)।

(১) ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা : ১৭৭৬ সালে আমেরিকায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিষয়ে কতিপয় সুস্পষ্ট অধিকারের কথা বলা হয়। তাতে উল্লেখ আছে "আমরা স্বত-প্রমাণিত এই সত্যকে তুলে ধরতে চাই যে সকল মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান, তারা জীবন, স্বাধীনতা ও সুখলাভের মতো নির্দিষ্ট কিছু অধিকারে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সুসজ্জিত। যে অধিকার সরকারের তত্ত্বাবধানে সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সুরক্ষিত...।"[৫]

যদি কোনো সরকার জনগণের এ অধিকারসমূহ লংঘন করে, তাহলে জনগণের অধিকার থাকবে ঐ সরকারকে বাতিল করা এবং নতুন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা। বেন্থাম এই স্বাধীনতার ঘোষনায় বর্ণিত অধিকারগুলোকে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন যে, "সকল মানুষ স্রষ্টা কর্তৃক কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার পেয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার এবং সুখ-সন্ধানের অধিকার। এই অধিকারগুলো মূলত একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"[৬]

(২) ১৭৯১ সালের আমেরিকার বিল অব রাইটস : আমেরিকান সংবিধানে প্রথম দশটি সংশোধনী নিয়ে ১৭৯১ সালে যে বিলটি গৃহীত হয় তাকে বিল অব রাইটস বলা হয়। জেফারসন হলেন 'বিল অব রাইটসের আধ্যাত্মিক পিতা'। উক্ত বিলের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সহজাত অধিকারগুলো আইনগতভাবে স্বীকৃত হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এর রক্ষা ও বাস্তবায়নে দায়বদ্ধতা আসে। আমেরিকার সংবিধানে আনীত এসব সংশোধনীগুলোর মধ্যে সরাসরি মানবাধিকারসংশ্লিষ্ট মুখ্য দিক হলো- কথা বলা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে একত্রিত হওয়া, দুঃখ দুর্দশায় ক্ষতিপূরণ লাভের আবেদন এবং স্বাধীন ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার। (প্রথম সংশোধন)

-ব্যক্তি, ঘরবাড়ী, কাগজপত্র এবং অহেতুক অনুসন্ধান ও আটক করা থেকে নিরাপত্তার অধিকার (২য় সংশোধনী)।

-যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া ব্যতীত জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না করা। (পঞ্চম সংশোধনী)

-অতিরিক্ত জামানত বা জরিমানা এবং নির্যাতন ও অপ্রচলিত শাস্তি থেকে মুক্তি। (অষ্টম সংশোধনী) [৭]

ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কার্টা ও অন্যান্য প্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিকশিত রূপ হিসেবে আমেরিকায় মানবাধিকার ধারণা ও এর সংরক্ষণ অনুসরণের বিকাশধারা তরান্বিত হয়।

আমেরিকান বিল অব রাইটস নামে পরিচিত এ মৌলিক অধিকারগুলোর বিশেষত্ব এই যে, এ অধিকারগুলোও বৃটেনের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারগুলোর অনুকরণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশ করা হয়েছে।[৮]

গ. ফরাসি প্রেক্ষাপট

১৯৬৭ সালে ফরাসি মানবাধিকার ঘোষণা বৃটিশ ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রণয়ন করা হয় এবং এই ঘোষণা ১৯৭১ সালের ফরাসি সংবিধানে সন্নিবেশ করা হয়। এতে কতিপয় মৌলিক অধিকার সংযোজন করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

- ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার;
- আইনের চোখে সকলেই সমান;
- জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার;
- চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা;
- সমাবেশের অধিকার;
- ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার;

- মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা;
- সরকারী কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব।

এ ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, "Men are born and remain free and equal in rights." এই রাইটসগুলো হচ্ছে সংক্ষেপে স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা এবং নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার। ফরাসি ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারগুলো হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষের একান্ত অধিকার। এ অধিকারগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের মানবাধিকার বিকাশের জন্য এটাকে গাইড লাইন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে।

উপরে উল্লেখিত বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মানবাধিকার সনদগুলো পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সর্বজনীন নীতি, ধ্বংসহীনতার নীতি এবং আইনের অনুশাসন এর মতবাদ দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটকালে জনগণ কর্তৃক দাবিকৃত মানবাধিকারের প্রকৃতিসম্পন্ন কতিপয় সুবিধা (তাদেরকে) প্রদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত মানবাধিকার দলিল থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সহজাত নীতি, ধ্বংসহীনতার নীতি এবং আইনের অনুশাসনের নীতি ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে আর্ন্তজাতিকতায় রূপ নিতে থাকে। প্রত্যক্ষ করা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যহিত পরে গৃহীত 'লীগ আব নেশনস' এর সনদে এ বিষয়গুলো অনুক্তভাবে উল্লেখিত থাকে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গৃহিত জাতিসংঘ সনদে এগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় এবং মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিক রূপ প্রদান করা হয়। এভাবেই জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভূত মানবাধিকার আর্ন্তজাতিক আইনে স্বীকৃতি লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবাধিকারের বিকাশধারা নানারূপ ও পর্যায়গতভাবে বিকশিত হলেও এর স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা আসে জাতিসংঘের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধ্বংস-বিভীষিকার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার আজকের চেহারা পেয়েছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, হিটলারের শাসনে আর যাই হোক মানুষের জীবন, অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে কোনোমাথা ব্যাথা ছিল না। এ ছিল হিটলারের শাসন আমলের বিপদজনক দিক। এ কারণেই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়ার কাজটি কঠিন হয়নি।

১৯৪৫ সালের একটি সনদের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রথম ধারাতেই মানবাধিকার প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য স্থান পায়। চার অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মানবাধিকার এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া জাতিসংঘ সনদের ৮, ১৩, ৬২, ৬৮, ৭৬ প্রভৃতি ধারায় বিভিন্নভাবে মানবাধিকার ও মানব মর্যাদার প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের সম্পূরক হিসেবে মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি পৃথক ঘোষণা (Declaration on the Essential Rights of Man) প্রদানের বিষয়টি ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনেই বিবেচিত হয়।

২.২: অধিকারের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ

বিভিন্ন সময়ে অধিকার সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তা জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকার সম্পর্কে রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। শতাব্দীর শেষদিকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আমেরিকা ও ফ্রান্সে ব্যাপক আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। অবশ্য এর পূর্বে হবস্, লক্ ও রুশোর মতো চুক্তিবাদী দার্শনিকগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মানুষের অধিকার সম্পর্কে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার অধিকারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। এ সব মতবাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো (১) প্রাকৃতিক অধিকার বিষয়ক মতবাদ (২) অধিকারের আইন বিষয়ক মতবাদ (৩) অধিকারের ভাববাদী মতবাদ ও (৪) অধিকারের মার্কসবাদী মতবাদ ।

প্রাকৃতিক অধিকার (natural rights)সম্পর্কিত মতবাদঃ

প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কিত মতবাদ অনুসারে, মানুষ কতগুলো অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত অধিকারগুলো অপরিত্যাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির উর্ধ্বে। এই মতবাদের প্রবক্তাদের মতানুসারে মানুষ কতগুলো সর্বজনীন অধিকার ও ন্যায়বোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এগুলো স্বাভাবিক, অপরিহার্য, চিরন্তন ও অবাধ। "মানুষের দেহের বর্ণের মতো স্বাভাবিক অধিকার মানুষের সহজাত ও অঙ্গীভূত। এগুলোর ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তারা স্বত:প্রমাণিত সত্য।"[১০] প্রাচীন গ্রীসের স্টোয়িক দার্শনিক এবং পরবর্তীকালে রোমান আইনবিদদের লেখায় স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা দেখা যায়। এই তত্ত্বের উৎপত্তির ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন হলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুখ্যত: চুক্তিবাদী হবস্, লক ও রুশোর লেখায় এই মতবাদ বিকাশ লাভ করে। হবস্ স্বাভাবিক অধিকার বলতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা অনুসারে যা খুশী করার অবাধ স্বাধীনতা বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে,"কারো প্রাকৃতিক অধিকার হলো তার প্রাকৃতিক ক্ষমতা। প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির সবকিছু করার অধিকার রয়েছে, এমনকি একের অন্যের প্রতি অধিকারও স্বাভাবিক।" তিনি আরো বলেন,"...সার্বভৌমের হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রত্যেকের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে।"[১১] আদর্শবাদী গ্রীন (T.H Green)[১২] এর অভিমত হলো, প্রতিটি মানুষের নৈতিক উপলব্ধির জন্য যে অধিকারগুলো আবশ্যক সেগুলোই হলো স্বাভাবিক অধিকার। সেই অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে রাষ্ট্র ব্যক্তির নৈতিক সত্তাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে।

প্রাকৃতিক কথাটির কোনো নির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ নেই। সে জন্য প্রাকৃতিক অধিকারের কোনো নির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য রূপ নেই। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত দাবিকে অধিকার বলে। সুতরাং রাষ্ট্র নিরপেক্ষ অধিকারের অস্তিত্ব অসম্ভব। বোসাংকেত[১৩] এর মতে, অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হতে পারে না। জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) ও হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্বের সমর্থক। হিতোবাদী বেন্থামের[১৪] মতে, অধিকার হলো সমাজস্বীকৃত দাবি। তাঁর মতে, natural rights as "arhetorical nonsence upon stilts." বেন্থাম প্রাকৃতিক অধিকার বলতে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগকে বুঝিয়েছেন। বেন্থাম মানবাধিকারকে আইনের মাধ্যমে এমনকি প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন । রাষ্ট্র হলো একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, সমষ্টি ও ব্যষ্টির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সমাজের মোট সুখ বা আনন্দকে বাড়িয়ে তুলতে কেবল রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন সাহায্য করে। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয় আনন্দ বা সুখকে উপভোগ করার জন্য এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্র আইন রচনা করে ব্যক্তিকে সাহায্য করে। এভাবে বেন্থাম অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার অর্থে বিচার না করে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত আইনের মাধ্যমে সংরক্ষিত দাবি অর্থে গ্রহণ করেন।

স্পেন্সারের মতে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাধীনতা হলো প্রাকৃতিক অধিকার। 'Social Statics' গ্রন্থে স্পেন্সার বলতে চান, রাষ্ট্র গড়ে ওঠার আগেই মানুষের স্বাধীনতা ছিল। এটি মানুষের সেই প্রাথমিক প্রাকৃতিক অধিকার। রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পর অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজে নাগরিক অধিকারের ধারণাটি পুরোপুরিভাবে এসেছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সমাজেই মানুষ পেল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির যাবতীয় অধিকার। মানুষ লাভ করল দৈহিক অলঙ্ঘনীয়তার অধিকার, যাতায়াতের অধিকার, বাক ও মতপ্রকাশের অধিকার, ধর্ম বিশ্বাসের অধিকার, সম্পত্তি অর্জন, ব্যবহার, দান ও উত্তরাধিকারের স্বাধীনতা, চুক্তির স্বাধীনতা ইত্যাদি। স্পেন্সার মনে করেন না এসব অধিকার সমাজ গড়েই মানুষ পেয়েছে। এগুলো মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার, রাষ্ট্র এগুলোকে আইনগত রূপ দিয়েছে মাত্র।

মার্কসবাদীদের মতানুসারে, প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। প্রাকৃতিক অধিকারের নীতি স্বীকার করে নিলে সমাজে মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। হিউম '*Political Discourses*' গ্রন্থে প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে বলেন, প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাটি বাস্তবসম্মত নয়। এটি সাধারণ মানুষকে বৈপ্লবিক কাজে উদ্দীপ্ত করে এবং এরূপ ধারণা দেয় যে তারা এমন সব জিনিসের অধিকার পাওয়ার যোগ্য, যা তারা আসলে পায় না।

উপর্যুক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও, স্বাভাবিক অধিকার বলতে যদি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কল্যাণকর ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী অধিকার সমূহকে বোঝায়, তবে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সামন্ত সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই মতবাদের আবির্ভাব একসময় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

অধিকারের আইনগত মতবাদ

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবি। অধিকার হলো সামাজিক ধারণা। তাই সমাজের বাইরে এর সৃষ্টি অসম্ভব। বোসাংকেতের (Bosanquet) মতে, অধিকার হলো সমাজ কর্তৃক প্রযুক্ত দাবি। অধিকার রাষ্ট্রীয় আইনের আপেক্ষিক বলে আইনের পরিবর্তনের সঙ্গে অধিকারের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অধিকার কোনোসহজাত, সমাজ বা রাষ্ট্র নিরপেক্ষ নয়। আইনের দ্বারা স্বীকৃত বলেই অধিকার লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে। এই মতবাদে রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তির কোনো অধিকার স্বীকার করা হয় না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদার নৈতিক চিন্তাবিদ অস্টিন, বেন্থাম, রিচি, সল্‌মন্ড প্রমুখ অধিকারের আইনগত তত্ত্ব প্রচার করেন। বেন্থামের মতে, অধিকার হলো আইনের ফলস্বরূপ। *Principles of legislation* গ্রন্থে (1989) এ বলেন, "পুরোপুরিভাবে তথাকথিত অধিকার তথাকথিত আইন দ্বারা সৃষ্টি হয়। বাস্তব আইনই বাস্তব অধিকারের জন্ম দিতে পারে"। রিচি'র[১৫] মতে,"আইনগত অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত পরস্পরের ওপর প্রযুক্ত দাবি।"

অধিকারের আইনগত মতবাদটি বিভিন্ন চিন্তাবিদ দ্বারা সমালেচিত হয়। ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করে না, রাষ্ট্র কেবল অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করে। আইনানুমোদিত না হয়েও অধিকার থাকতে পারে। ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক দাবি বলবৎযোগ্য বলেই অধিকারে পরিণত হয় না; বরং অধিকার বলেই রাষ্ট্র এগুলোকে বলবৎ করে। অধিকারের আইনগত তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই। এটা ঠিক নয়, কেননা রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির কোনো অধিকার খর্ব করে তাহলে সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তির উচিত রাষ্ট্রকে সেক্ষেত্রে বাধা দেওয়া। মার্কসবাদীদের মতে, আইনগত দৃষ্টিতে সমাজের বৃহত্তর অংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। ধনবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও আইন অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে, অধিকারের আইনগত মতবাদই অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক ধারণার সৃষ্টি করেছে।

অধিকারের ভাববাদী মতবাদ

অধিকার বিষয়ক মতবাদগুলোর মধ্যে ভাববাদী মতবাদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল, গ্রীণ ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তার মূল কথা ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ অসম্ভব। তাই অনেকে এ মতবাদকে ব্যক্তিত্ব বিষয়ক মতবাদ (Personality Theory) বলে অভিহিত করার পক্ষে। ভাববাদীরা অধিকারকে নৈতিকতার মানদন্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে, মানুষের নৈতিক প্রকৃতির মধ্যেই অধিকারসমূহ নিহিত থাকে বলে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা দাবি করে। ভাববাদী দার্শনিক গ্রীণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্যকরণে আবদ্ধ বলে মনে করতেন। একের অধিকার ভোগ অপরের কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রতিটি ব্যক্তিকে অধিকার ভোগের বিনিময়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্র বা সমাজের কর্তব্য হলো প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সহায়তা করা। হেগেল রাষ্ট্রকে একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং নিজের সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ও নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ব্যক্তি বলে মনে করতেন। এ সম্পর্কে টি, এইচ গ্রীন (T.H.Green) বলেন, "প্রতিটি মানুষের নৈতিক প্রকৃতি উপলব্ধির জন্য যে অধিকারগুলো আবশ্যক সেগুলোই স্বাভাবিক অধিকার। এসব অধিকার সংরক্ষণ করে রাষ্ট্র ব্যক্তির নৈতিক সত্তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করে"। তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হলে ব্যক্তির যে কোনো অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য।

ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের মতে, অধিকার কোনো ব্যক্তির জন্য নয়, সব অধিকার সমাজের জন্য অথবা সম্প্রদায়ের জন্য। কেননা হেগেল ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রকে চুড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখেছেন। জার্মানীর রাজনৈতিক অঙ্গনে হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গির যে গভীর প্রভাব পড়েছে তার প্রমাণ ১৯৪৮ সালে জার্মান জাতীয়তাবাদী উদারপন্থীদের দ্বারা গৃহীত অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র। ঐ ঘোষণাপত্রে মানুষের অধিকার না বলে ব্যক্ত করা হয়েছে "জার্মানদের অধিকার"। হেগেল রাষ্ট্রকে চুড়ান্ত শক্তি বা লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। তার মতে, স্বাধীনতার স্পষ্ট উপলব্ধির মধ্যেই আছে স্বাধীন ইচ্ছার কার্যকর প্রকাশ। আইন ও নৈতিকতার স্বার্থক প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রের মধ্যে। হেগেলের মতে "রাষ্ট্র বিশ্বের শক্তির মূর্ত রূপ" সেই ঐশ্বরিক ভাব যা পৃথিবীতে বর্তমান। তাঁর ভাষায়, "রাষ্ট্র এক ভাব; প্রকৃত বা বাস্তব অবস্থার সর্বোত্তম প্রকাশ। রাষ্ট্র আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং আত্মোপলব্দিকারী ব্যক্তি, যার নিজস্ব ইচ্ছা, স্বার্থ ও অধিকার আছে। স্ব-ক্ষমতায় ও মহিমায় রাষ্ট্র উজ্জ্বল। রাষ্ট্র শুধুমাত্র উপায় নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটি নৈতিক শৃঙ্খলা ও মানদন্ডের প্রতীক, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রেরণা, স্বার্থক পরিবেশ ও বাস্তব প্রকাশ।"[১৬]

ব্যক্তির ইচ্ছার প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা ঘটে রাষ্ট্রের মধ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের রোমান্টিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হেগেল রাষ্ট্রে জাতীয় প্রেরণা (National Spirit) ধারণাটি আরোপ করেছেন। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে হেগেল তৎকালীন জাতীয় চিন্তা ও ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন।

অধিকারের ভাববাদী মতবাদ ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলে প্রচার করে। কিন্তু ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের বিরোধ দেখা দিলে ভাববাদী দার্শনিকরা কার্যত ব্যক্তির কল্যাণকে প্রাধান্য দেন। ফলে সামাজিক কল্যাণ উপেক্ষিত হয়। আবার হেগেলের মতো ভাববাদী দার্শনিকগণ ব্যক্তি জীবনের সবকিছু নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করে যে রাষ্ট্রসর্বস্বতার মতবাদ প্রচার করেছেন, কার্যত তা ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার হন্তারক মতবাদ হিসেবে সমালোচিত হয়।

অধিকারের মার্কসবাদী মতবাদ

মার্কসীয় ধারণা অনুসারে সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করার জন্য আবশ্যিক সুযোগ সুবিধাই হলো অধিকার। এই অর্থে একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অপরদিকে সামাজিক সম্পর্কের ওপর অধিকার নির্ভরশীল। সামাজিক সম্পর্ক অধিকার ভোগের ব্যাপারে প্রধান নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে অধিকারের ধারণা শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকার শ্রেণীস্বার্থ নিরপেক্ষ এবং তা জনগণের অধিকার হতে পারে না। বৈষম্যমূলক সমাজে অধিকার বলতে মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণীর অধিকারকেই বোঝায়। তবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে কোনো অধিকার ভোগ করা যায় না। মার্কসীয় ধারণা অনুসারে অধিকার ও কর্তব্য দুটি স্বতন্ত্র বিষয় নয়। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তির অধিকার ভোগের সঙ্গে সমাজ ও সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কর্তব্যের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অধিকারের স্বার্থকতা ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপর নির্ভরশীল।

২.৩: বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা ও মানবাধিকার

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি একদিনে অর্জিত হয়নি। বস্তুত মানবাধিকার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে আজ আইনগতভাবে প্রতিষ্টিত একটি প্রত্যয়ে পরিণতি লাভ করেছে। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষনা পত্র মানবাধিকারের প্রাথমিক দলিল বিশেষ। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষনাই এ সম্পর্কিত সবচেয়ে মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশক দলিল। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে এই দলিলে নতুন দুটি চুক্তি সংযোজিত হয়, যার একটি নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার, অন্যটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার । এছাড়া জাতিসংঘের দলিলে মানবাধিকারের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন গণহত্যা, অত্যাচার ও নিপীড়ন, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্য এবং শিশু অধিকার সংবলিত চুক্তি সংযোজন করা হয়।

এই ঘোষনাটি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ডব্লিউ এইচ ও (হু) এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলো মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০১ সালের ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন রির্পোটে মানবাধিকার গ্রহণ এবং মানবাধিকারের ফলে সংঘাতময় আইনসমূহের সংশোধন বা বিলোপের সুপারিশ করা হয়।

মানবাধিকারের বিষয়টি বিগত দুই হাজার বছর ধরে দার্শনিক এবং রাজনৈতিক বিতর্কের একটি প্রধান ধারা হিসেবে চলে আসছে। আর এই বিতর্ক ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়ার সর্বত্রই এখন বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। মানবাধিকারের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় "প্রাকৃতিক অধিকার" (natural right)-এর ধারণার মধ্যে যা ক্লাসিক্যাল গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষের অধিকার সম্পর্কিত এই মত স্টোয়িক দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ স্টোয়িক দার্শনিকরা যে প্রাকৃতিক অধিকারের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা ছিল সর্বকালের সব মানুষের জন্য, বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের বা নাগরিকদের জন্য নয়।[১৭]

তাঁদের মতে, ঈশ্বর মানুষকে এমন কিছু অধিকার দিয়েছেন যেগুলো কোনো পরিস্থিতিতেই হরণযোগ্য নয়। হুগো গ্রোটিয়াস কথাটা আরেকটু বাড়িয়ে বলেন, "প্রাকৃতিক আইন এতটাই অপরিবর্তনীয় যে খোদ ইশ্বরের পক্ষেও সেগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়; কারণ এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে তাঁর কর্তৃত্ব খাটেনা। তিনি যদি সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে একদম পরিষ্কার বিষয়ও

অর্থহীন হয়ে পড়ে।"[১৮] গ্রোটিয়াস-এর ভাষায়, স্বাভাবিক আইন হলো, "সঠিক যুক্তির নির্দেশ, যেকোনো ইচ্ছার পরিবর্তে মানব প্রজ্ঞার ফলস্বরূপ।"[১৯]

এই আইন প্রকৃতির নীতি অর্থাৎ যা স্বাভাবিক, যা যুক্তিসঙ্গত তার সঙ্গে সংগতি বিধান করেই চলে। সম্ভবত এ কারণেই নৈতিক প্রয়োজন এবং সুবিচারের ধারণার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই আইনের আওতায় পড়ে এমন কাজ সঠিক হতে পারে বা বেঠিক হতে পারে কিন্তু তা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা মর্জি বা আজ্ঞার অধীন নয়। ঈশ্বরের বা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর এই আইন নির্ভরশীল নয়। এই আইন অলঙ্ঘনীয় (absolutely immutable); ঈশ্বরও একে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তিনি আরো বলেন, স্বাভাবিক আইন মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের, জাতির সার্বিক অস্তিত্বের পক্ষে যা প্রয়োজন, যা শুভ তার প্রতিই ইঙ্গিত করে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর *Republic* এবং *Law* গ্রন্থে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তির কল্যাণ ও স্বার্থকে এর অন্তর্নিহিত বলে মনে করেন। প্লেটোর মূল লক্ষ্য ছিল, ব্যক্তির নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো। প্লেটো ব্যক্তি মানুষকে অধিকার বোধে নয়, কতর্ব্যবোধে ও সেবাধর্মে সচেতন করতে চেয়েছেন। শাসকের ত্যাগ ও সেবা এবং সাধারণ মানুষের পরিশ্রম ও আনুগত্যকে সম্বল করেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন এক আদর্শ ও সফল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পক্ষে যা কল্যাণকর হবে ব্যক্তির পক্ষে তা কল্যাণকর হতে বাধ্য।[২০] Wayper এর মতে,"রাষ্ট্র সংগঠনে ব্যক্তির ভূমিকার ওপর তার জীবনের অর্থ নির্ভর করে। পরম ভালো সমগ্রের সমষ্ঠির মধ্যে বজায় থাকে।"[২১]

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল তার *Politics*[২২] গ্রন্থে প্রাকৃতিক অধিকারকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে, বিচার ব্যবস্থা এমন কিছু প্রাথমিক নীতিমালা যা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত, সহজাত কারণে অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রের লক্ষ্য। রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র কল্যাণ থাকতে পারে না। তিনি আরো মনে করেন, কেবল অধিকার রক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে না, নাগরিককে নীতিবান ও ন্যায়বিচার সম্পন্ন করে তোলাই হলো এর প্রধান কাজ। তাঁর মতে, রাষ্ট্র স্বাভাবিক এবং এর মধ্যেই মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত জীবনের প্রয়োজন মেটাবে ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবে।

প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে সিসেরো বলেন, প্রাকৃতিক আইনের প্রয়োগ সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন, এটি সকল যুগে সকল জাতির কাছে বৈধ, প্রাকৃতিক অধিকার কোনো নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকের বিশেষ সুবিধা বা অধিকার নয়, এ অধিকার বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার। সিসেরো[২৩] তাঁর *De Republica*[২৪] গ্রন্থে রাষ্ট্র বলতে বুঝিয়েছেন, আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণ আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণেই নিয়োজিত। রাষ্ট্র এক নৈতিক সংস্থা, নাগরিকের ঐক্য, দায়িত্ববোধ ও অধিকারের ওপর এই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তিনি আরো বলেন, প্রকৃতির সার্বিক আইন যেমন ঈশ্বরের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের নিয়ম থেকে উদ্ভূত, মানুষের বিচারবুদ্ধিও তেমনি সামাজিক প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত, যা মানুষকে ঈশ্বরের সমজাতীয় করে তোলে। প্রকৃতির এই আইন যেন বিশ্ব-রাষ্ট্রের সংবিধান যা সর্বত্রই অভিন্ন এবং সব মানুষ ও জাতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য। যে আইন একে ভঙ্গ করে তা আইন বলে গণ্য হতে পারে না।[২৫]

St. Thomas Aquinas তাঁর *Summa Theologica*[২৬] গ্রন্থে প্রাকৃতিক আইন মতবাদের ওপর গুরত্ব প্রদান করে বলেন যে, প্রাকৃতিক আইন স্থানীয় আইনের উর্ধ্বে এবং তা মেনে চলতে সকল শাসকেরা বাধ্য। তাঁর মতে, আইন একাধারে শাশ্বত, স্বাভাবিক মানবিক ও স্বর্গীয়। তিনি আরো বলেন, সেটাই সত্য ও ন্যায় যা নিত্য, যা সনাতন ইচ্ছার অনুসরণ করে এবং যার মাধ্যমে প্রত্যেকে তার নিজের অধিকারকে নিরাপদ করে।[২৭] ন্যায় সমতাকেই প্রতিফলিত করে এবং অ্যাকুইনাসের দৃষ্টিতে সমতা হলো প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সমদৃষ্টি এবং প্রত্যেকের সমান অধিকার। স্বর্গীয় বা সনাতন আইনের দৃষ্টিতে এই ন্যায়বিচার ও সমতা পূর্ণভাবে প্রতিফলিত। তাঁর মতে, ভালো-মন্দ বিচার গুণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হতো, যেখানে মানুষকে দেওয়া হয়েছিল ভালো কাজ করার সঠিক বুদ্ধি এবং খারাপ কাজ না করার সুচিন্তিত বিবেকবোধ।

পরবর্তীতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা হবস, লক ও রুশোর মাধ্যমে এই মতবাদ বিকাশ লাভ করে। তাঁদের মতে, প্রাক-রাষ্ট্রীয় যুগে প্রাকৃতিক অধিকার ছিল, যা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। পরবর্তীতে হবস্ তার *লেভিয়েথান*[২৮] গ্রন্থে এই প্রাকৃতিক অধিকারের নতুন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন কোনটি খারাপ কাজ কোনটি ভাল কাজ তা নির্ধারিত হয় প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে। তাঁর মতে, এই প্রাকৃতিক অধিকার ছিল মূলত আত্মরক্ষার একটি কৌশল।

থমাস হব্‌স প্রাকৃতিক অধিকার বলতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা অনুসারে যা খুশি করার অবাধ স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। হব্‌স *Leviathan* গ্রন্থে দেখান, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের স্বাধীনতা ছিল, সমতা ছিল কিন্তু ছিল না নিরাপত্তা। আইনের রাজ্যে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা উভয়েরই পরিবেশ গড়ে দেয়। আইনের রাজ্য শান্তি ও সহবস্থানের রাজ্য। হব্‌সের মতে, প্রকৃতির এই আইনই মানুষকে বুদ্ধি ও বিবেকের পথে চলতে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে এবং একটি সাধারণ ক্ষমতাকে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

পরবর্তীতে ১৭০০ শতকের শেষ দিকে জন লক্ তাঁর বিখ্যাত *Two Treaties on Civil Government*[২৯] গ্রন্থে প্রাকৃতিক অধিকারকে তুলে ধরেন। তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশগুলোর প্রতিধ্বনি হয়েছে বলে মনে করা হয়। লকের রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রভাব আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র' এবং ফ্রান্সের নাগরিকের 'অধিকারের ঘোষণাপত্রের' ওপর পরিলক্ষিত হয়। এ সময় ফ্রান্সে মানুষের জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত ১৭ টি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মানবাধিকার সম্পর্কিত ফ্রান্সের এই বক্তব্য অনেকের দ্বারা সমালোচিত হয়। জেরেমি বেন্থাম[৩০] মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ফ্রান্সের এই ঘোষণাপত্রকে সমালোচনা করেন, কারণ তিনি মনে করেন এর সাথে প্রাকৃতিক অধিকারের সম্পর্ক কম। এডমুন্ড বার্কও ফরাসী ঘোষণাপত্রের সমালোচনা করেন। পরবর্তীতে টমাস পেইন ফ্রান্স ঘোষণাপত্রে সংরক্ষিত মানুষের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের সমালোচনা করেন এবং প্রাকৃতিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। প্রাকৃতিক অধিকার মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে কিছু বিশেষ অধিকারকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, নাগরিক অধিকারে মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকারটুকুই থাকবেনা, এর সাথে থাকবে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, স্বাধীনতার অধিকার।

জন লক তাঁর *Two Treaties on Civil Government* গ্রন্থে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে স্বাভাবিক অধিকারের কোনো ক্ষতি হয়নি বরং রাষ্ট্রের ওপরই স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে।[৩১] লক এর ভাষায়, প্রকৃতির রাজ্য ছিল 'পূর্ণ স্বাধীনতার রাজ্য' 'সাম্যের রাজ্য' 'শান্তি, সদিচ্ছা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুরক্ষার রাজ্য।' ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়েছে। এই নীতিই ছিল প্রকৃতির আইন। এই প্রকৃতির আইনের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাজসৃষ্ট স্বাভাবিক আইনের কোনোবিরোধ ছিল না, বরং বলা যেতে পারে স্বাভাবিক আইনের সৃষ্টি ও বিকাশে প্রাকৃতিক আইন

সহায়ক হয়েছে। লকের কথায়, প্রাকৃতিক আইন সেই নিয়মের সমষ্টি যা সর্বযুগে সর্বক্ষেত্রে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রন করে। এ আইনের বিচারক হলো প্রজ্ঞা (Reason)। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সমানাধিকার এই আইনেরই সৃষ্টি। সমানাধিকারের এ ধারণা থেকেই এসেছে আত্মরক্ষা, অধিকারবোধ ও মানবিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রশ্ন। প্রকৃতির রাজ্যে নিজের সুখ ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করাই ছিল স্বাধীনতার লক্ষ্য। কিন্তু এ স্বাধীনতা হলো সামাজিক স্বাধীনতা; সকলে মিলেমিশে, সুখে-শান্তিতে বসবাস করার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আসে মানুষের শৃঙ্খলাবোধে, আইন মেনে চলার শর্তে। এ আইন মানুষের সৃষ্ট আইন। এ আইন স্বাধীনতার সংকোচন নয়, স্বাধীনতার প্রসারে কার্যকরী। লকের কথায়, 'প্রজ্ঞা, এমন বিষয় যা সকল মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে তারা সকলে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর এবং অন্য কারো তাদের জীবন, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা বা সম্পদের ক্ষতি করা উচিত নয়।'[৩২]

লকের মতে, নৈরাজ্যেরে বিরুদ্ধে নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে, নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে নিরাপদ করতে, সামাজিক শৃঙ্খলাকে সুরক্ষিত করতেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে, রাষ্ট্র গঠন করা এবং নিজেদেরকে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের শাসনাধীনে আনার প্রয়োজন অনুভব করল মানুষ। লকের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মধ্যে নয়, জীবনকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে। সম্পত্তিই মানুষকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। লক সম্পত্তি কথাটির মধ্যেই অন্যান্য অধিকারের তাৎপর্য দেখেছেন। এটি ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য অধিকারের মতো এই অধিকার মানুষ লাভ করেছে। সমাজের কাছে, প্রকৃতির রাজ্য বা রাজনৈতিক সমাজ উভয়ের কাছেই এই অধিকার তার ন্যায্য দাবি। এ দাবিকে অস্বীকার করার বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা সমাজ বা সরকার কারো নেই।

রুশো তাঁর বিখ্যাত সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত মতবাদের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর চিন্তায় স্বাভাবিক অধিকার সমস্টিগত ইচ্ছা (general will)-র অঙ্গীভূত। এই সমষ্টিগত ইচ্ছাই হলো জীবন, স্বাধীনতা ও অপর সকল বিষয়ের সংরক্ষক। তিনি বলেন সমাজ যদি ব্যক্তিকে রক্ষা করে তাহলে মানুষ একত্রে বাস করতে এবং একই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে সম্মত হবে। এই প্রেক্ষাপটে এমন সব অধিকার প্রদান কার উচিত যা ব্যক্তি-স্বার্থকে সরাসরি দ্বন্দ্বে পরিণত করতে না পারে। রুশো রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে ধর্মের ভূমিকাকে সমালোচনা করেন এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক অধিকার থেকে আলাদা করেন। তিনি সামাজিক অধিকারকে পবিত্র বলে ব্যক্ত করেন এবং তার বিস্তারিত বর্ণনা করেন। রুশোর মতে, সাধারণের ইচ্ছাই হলো জীবন, স্বাধীনতা ও অপর সকল অধিকারের সংরক্ষক।

সাধারণের ইচ্ছা ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্বের নিরসন করতে চেয়েছেন। রুশো মনে করেন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বা সমাজের পারস্পরিক বাধ্যবাধকতায়, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য পালনেই সামাজিকবন্ধন অটুট থাকে এবং স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। *Social Contract*[৩৩] গ্রন্থে রুশোর বক্তব্য হলো, মানুষের কতগুলো নৈতিক ও সাধারণ অধিকার থাকে এবং এই অধিকারগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্যই সে চুক্তি করে সরকার গঠন করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, এই সময়ই অধিকার সম্পর্কে বাস্তব ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবিক অধিকারের ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পর্বের আগেও প্রচারিত হয়েছে লক ও মন্টেস্কুর চিন্তায় কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পর্বে রুশো বা ভলটেয়ার, ফিজিওক্র্যাট, টমাস পেইন অধিকার সম্পর্কে যে ভাবনা পেশ করেন তা অধিকতর বাস্তবসম্মত।

মানুষের অধিকারের দর্শন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন টমাস পেইন। ১৭৯১ সালে পেইন এর *Right of Man*[৩৪] এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় এবং বইটির খ্যাতির কারণ সাধারণ মানুষ এর মাধ্যমে রাজনীতি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছে। পেইনের অধিকার দর্শনের মূলকথা হলো মানুষকে জাগ্রত করার, পৃথিবীকে উন্নত করার বাসনা। তাঁর মতে, সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি। সুতরাং মানুষকে বাদ দিয়ে, তার অধিকারকে বাদ দিয়ে সমাজ বা সরকারের কথা ভাবা চলেনা। অতীতের সরকার ছিল বংশ পরম্পরায় সরকার। এই সরকার মানুষের ওপর তার ইচ্ছা ও নীতি চাপিয়ে দেয় এবং যে উদ্দেশ্যে সরকারের সৃষ্টি সেই মানবকল্যাণের পথেও এই সরকার অন্তরায়। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই সমাজ ও সভ্যতাকে তার ভিত্তি হিসেবে এবং প্রকৃতি, যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে। মানুষই এই সরকারের বিচারক, অভিভাবক আইনই এই সরকারের শক্তি, ব্যক্তি বা নেতা নয়।

পেইনের মতে, স্বাভাবিক অধিকার হলো মানুষের বাঁচার, অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার। এই অধিকার মানুষের সুখ ও শান্তি পাবার অধিকার। পৌর অধিকার হলো সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে অধিকার লাভ করে। স্বাভাবিক অধিকার পৌর অধিকারের ভিত্তি। পৌর অধিকার পেতে মানুষের নিজের ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন রাষ্ট্র ও আইনের সহায়তা। পেইন ছিলেন ফ্রান্সের অধিকার ঘোষণাপত্রের অনুবাদক এবং মানবাধিকারের প্রধান প্রচারক। পেইন ফরাসি অধিকারের ঘোষণাপত্রের চারটি ধারাকে তাঁর অধিকারের তত্ত্বে উপস্থিত করেছেন। এগুলো হলো ঃ

- মানুষ জন্ম থেকেই অধিকারের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সমান।
- সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অধিকারগুলোকে রক্ষা করা। এগুলো হলো স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার এবং পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার।
- জাতিই সব সার্বভৌমিকতার উৎস কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়।
- রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো অন্যকে আঘাত না করে, অন্যের ক্ষতিসাধন না করে মানুষের কোনো কিছু করার ক্ষমতা। স্বাভাবিক অধিকার (অন্যের অধিকার ছাড়া) অন্য কিছুর দ্বারা সীমিত নয়। আইনই স্থির করবে অধিকারের এই সীমা।

ফরাসী সংবিধানে সমানাধিকারের ধারণাটি যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা মানুষের বিদ্রোহের অধিকার বিষয়ে যা বলা হয়েছে, জাতিকে উর্ধ্বে রেখে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যে কথা বলা হয়েছে এক কথায় তা অভূতপূর্ব। অধিকারের এমন সহজ অর্থ, সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এর আগে পাওয়া যায়নি। পেইন বলেন, অধিকারের ঘোষণা কর্তব্যের ঘোষণাও বটে। আমার যা অধিকার অন্যের তাই অধিকার। সুতরাং আমার কর্তব্য হলো অপরের অধিকার ভোগ ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। পেইন ফরাসি অধিকার ঘোষণার চতুর্থ ধারণাটির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত, "স্বাধীনতার সীমা কেবল আইন দ্বারা সীমিত হতে পারে"। পেইন গুরুত্ব দেন অধিকার ঘোষণার সেই অংশটিকে যেখানে বলা হয়েছে,"আইন হলো সংঘের ইচ্ছার প্রকাশ।" এখানে পেইন আইনকে অধিকারের ধারক, বাহক ও সংরক্ষক হিসেবে তুলে ধরেন।

টমাস পেইন *Right of Man* গ্রন্থে বলেন, স্বাভাবিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণই হলো সকল রাজনৈতিক সংঘের লক্ষ্য। স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার ও অত্যাচার প্রতিরোধের অধিকার স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ও ফ্রান্সের মানুষের অধিকার সনদে এ স্বাভাবিক অধিকারের প্রতিফলন দেখা যায়। আমেরিকার সনদে বলা হয়েছে, মানুষ স্রষ্টার দ্বারা কতগুলো অবিচ্ছেদ্য অধিকারে মন্ডিত। এসব অধিকার হলো জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ অন্বেষনের অধিকার। ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে স্বাধীনতা, সাম্য, নিরাপত্তা ও সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

কার্ল মার্কস মানবাধিকার সর্ম্পকে ইতিহাসের বস্তুবাদী (বৈজ্ঞানিক) ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষ প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজে সমান অধিকার ভোগ করত। কিন্তু দাস

সমাজ এবং সামন্ত সমাজে মানুষের অধিকার বলে কিছুই ছিল না। পরবর্তীতে পুঁজিবাদী সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ মানুষ মানবাধিকারের সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারছেনা। কারণ পুঁজিবাদীরা তাদের পুঁজি বাড়ানোর জন্য সমাজের অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ফলে সাধারণ মানুষ এবং শ্রমিক শ্রেণী মানবাধিকারের যথার্থ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয় তবে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হবে।

মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ খোদ মানবাধিকারের ধারণাটিরই বিরোধী। তাঁদের মতে, মানবাধিকার হলো পতনোম্মুখ পুঁজিতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া মূল্যবোধ। তাঁদের যুক্তি হলো, এ মূল্যবোধ একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কের উপজাত; এ মূল্যবোধ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অলীক মতাদর্শের মোড়কে সবার সামনে হাজির করা হয়। উৎপাদন সম্পর্কের বা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে এ ধরণের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়।[৩৫]

মার্কস সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যার নীতিধর্মী বা নৈতিক সমাধানকে শুরু থেকেই নাকচ করে দেন। মার্কস নিজে কখনো ন্যায়ের কোনো তত্ত্ব প্রদান করেন নি। তিনি বলেননি যে, পুঁজিবাদী সমাজ অন্যায়ভিত্তিক। তাই এর নৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। তাঁর মতে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতির সঙ্গে শ্রমিকের সংঘাত হলো এক ধরনের অধিকারের সঙ্গে অন্য ধরনের অধিকারের সংঘাত; আর এটা কেবল দুই পক্ষের শ্রেণি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই নিরসন হবে। এ প্রসঙ্গে মার্কসীয় চিন্তার তাত্ত্বিক লেজেক কোলাকোস্কি অভিমত পোষণকরেন যে, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে, শ্রেণি এবং শ্রেণি সংগ্রামের বিলোপের মধ্য দিয়ে সমাজদেহ থেকে সংঘাত সমূলে উচ্ছেদ হবে। ফলে একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে অন্য একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাত অপ্রাসঙ্গিক হবে; বাস্তব জীবনে সবার অধিকার নিশ্চিত হবে এবং একই সঙ্গে মানবাধিকারের ধারণাটিও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।[৩৬]

তথ্য নির্দেশ

১. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও আখতারুজ্জামান, *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তাদানের মূলনীতি*, হিউম্যানিষ্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ.৬।

২. মোঃ নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার ও সমাজকর্ম*, (নিউএজ পাবলিকেশান, ঢাকা, ২০০৫) পৃষ্ঠা.২৩।

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪।

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬।

৫. F.K.M. Munim, *Rights of the Citizen Under the Constitution and Law*, Bangladesh Institute of Law & International Affairs, Dhaka, 1975, p.29

৬. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও আখতারুজ্জামান, *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তাদানের মূলনীতি*, পৃষ্ঠা.৯।

৭. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ*, (রোহেল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৫), পৃ.৪১।

৮. Munim, *Ibid*, P.3.

৯. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও আখতারুজ্জামান, *মাবাধিকার ও আইনগত সহায়তাদানের মূলনীতি*, পৃষ্ঠা.১১।

১০. E. Asirvatham, *Political Theroy* , (Lucknow : Upper India Pub ,1967), p.16.

১১., T. *Hobbes, Leviathan,* in W. Ebenstein, *Great Political Thinkers* (Oxford and IBH Publishing Company, 1966), p.368.

১২. W.Ebenstein, *Great Political Thinkers,* (Oxford and IBH Publishing Company, 1966), p.389.

১৩. B. Bosanquet, *The Philosophical Theory of State*, Chapter VIII, Sec.6 (Cambridge University Press, New York, 2011), p.245.

১৪. J.Bentham, *Principles of Legislation* in W. Ebenstein, *Great Political Thinkers* (Oxford and IBH Publishing Company, 1966), p.421.

১৫. D.G.Ritchi, *Natural Right,* (London: George Allen & Unwin Ltd.1952), p.58.

১৬. Hegel, *Philosophy of Right*, in Hollowell, *Main Currents in Modern Political Thought* (New York, Holt, 1960), p.263.

১৭. নীরুকুমার চাকমা, *মানবাধিকার ও নৈতিকতা*, বিশ্ব দর্শন দিবস-২০১২, দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব গবেষণা কেন্দ্র, পৃষ্ঠা.১৮।

১৮. Hugo Grotius, *Annals & History of the law countries*, manuscript 1612)-Pub. Amsterdam, 1657.

১৯. Grotius, in Dunning, *A History of Political Theories*, (Central Book Depot, Allahabad, 1967), p.162.

২০. প্লেটোর রিপাবলিক, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত,(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮),পৃষ্ঠা.১৯৬.

২১. C. L. Wayper, *Political Thought*, (B.I Publications 1975), p.36.

২২. *এরিস্টটলের পলিটিকস*, অনুবাদ, সরদার ফজলুল করিম, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩), পৃ. ১২৮.

২৩. সিসেরো একজন রোমান চিন্তাবিদ, যিনি রাষ্ট্র-দার্শনিকের চেয়ে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন।

২৪. সিসেরোর *De Republica* গ্রন্থটি প্লেটোর *Republica* এর আদলেই রচিত। প্লেটো তাঁর *Republica* এ যেমন একটি আদর্শ, ন্যায়নির্ভর রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন সিসেরোও তেমনি তাঁর *De Republica* গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুসন্ধান করেছেন।

২৫. "There was little that was original in the political thought of Cicero"-Gettell, *History of Political Thought*, p. 76. (London: George Allen & Unrin LTd.) 1932.

২৬. *Summa Theologica* গ্রন্থে একই সাথে সর্বজনীন আইন ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেন।

২৭. Dunning, *A History of Political Theories*, p -196.

২৮. Hobbes, *Leviathan*, in Ebenstein, *Great Political thinkers* (Oxford and IBH Publishing Company, 1966), p.369.

২৯. Locke, *Two Treatises*, in W.T. Bluhm, *Theories of the Political System*, (Prentice Hall of India, 1981), p.303.

৩০. Benthan J, *Principles of legislation in* Ebenstein *Great Political Thinkers*. p.425.

৩১. Locke, *Second Treatise of Civil Goverment*, Peter Laslett, (London: Cambridge University Press, 1960). p.57.

৩২. Locke, Two Treatises, in W.T. Bluhm, *Theories of the Political System*, (Prentice Hall of India, 1981), p.305.

৩৩. *Social Contract: Essays By Locke Hume and Rousseau with an Introduction* by Sir Ernest Barker, (Oxford University Press, London, 1978), p.2.

৩৪. J. Hampden Jackson, Tomas Paine and the *Rights of Man* David Thomson (ed) Political Ideas, p.108.

৩৫. আখতার সোবহান খান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮), পৃ. ১০৭।

৩৬. Leszek Kolakkowski: *Marxism and Human Righrs*, Daedalus, Vol.112, No.4, Human Rights, 1983, p.81-92.

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

মানবাধিকার আলোচনায় আইনের সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয়

৩.১ আইন: সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

অধিকার আগে না রাষ্ট্র আগে এ নিয়ে রাষ্ট্র দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল[১] মনে করেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পুর্বে অধিকার জন্মলাভ করেছে। অপরদল[২] মনে করেন যে, রাষ্ট্রই অধিকার সৃষ্টি করেছে। প্রথম দলটি প্রাকৃতিক অধিকারে বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয় দলটি আইনগত অধিকারে। প্রথম ধারার চিন্তাবিদগণ নৈতিক দৃষ্টিতে অধিকারকে ব্যাখ্যা করেন এবং দ্বিতীয় ধারার চিন্তাবিদগণ আইনের দৃষ্টিতে অধিকারকে বিচার করেন।

মানবাধিকার আলোচনায় আইনের সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয়ের পূর্বে আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। সাধারণ অর্থে, আইন বলতে কোনো বিষয়ের দিক নির্দেশনা বোঝায় যার আলোকে আমরা কাজ করি এবং যদি এই নির্দেশনা না মানি বা ভঙ্গ করি তাহলে ঐ আইন বা নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে বলা যায়। কাজেই আইনের সাথে স্বাধীনতার বিষয়টি জড়িত। যেমন গনতন্ত্রে আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে। এভাবে দেখা যায় আইনের সাথে দুটি বিষয় জড়িত -১. স্বাধীনতা (Liberty) ও ২. ন্যায়বিচার (Justice)। বিচারের ক্ষেত্রে কতগুলো সামাজিক নীতিমালা মানতে হয় দেখে মনে হয়, সরকারের কাছে বিচার চাইলে আমরা আশা করি ন্যায়বিচার হবে। আর এই বিচার হবে আইনের মাধ্যমে। কাজেই আইনকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ নির্দেশনা বলা যায়, যার দ্বারা রাষ্ট্রের আদান-প্রদান পরিচালিত হয় এবং অপ্রত্যাশিত আচরণকে নিরুৎসাহিত করা হয়[৩]

Oxford Dictionary- তে আইনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-"আইন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আচরণ বিধি যা রাষ্ট্রের বা সমাজের সকলে মানতে বাধ্য।"[৪] আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অস্টিন তাঁর- *Lectures on Jurisprudence* গ্রন্থে বলেন, "আইন হলো সার্বভৌমের নির্দেশ।"[৫] তাঁর মতানুসারে আইন হলো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত আদেশ। সার্বভৌমের আদেশ বলে তা বাধ্যতামূলকভাবে বলবৎ হয়। এই ধারণার অন্যান্য সমর্থকদের মধ্যে- হব্‌স, বোঁদা, হল্যান্ডের নাম উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক হল্যান্ডের[৬] (Holland) মতে, আইন হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রনের এমন কতগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। বাস্তব জীবনের বাহ্যিক দিক নিয়েই আইনের কাজ। আইন বাধ্যতামুলকভাবে বলবৎ হয়। কেননা আইনের পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনুমোদন থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আইন মান্য করা সামাজিক চাপ বা নৈতিক প্রভাব বা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করতে বাধ্য করার জন্য রাষ্ট্র বল প্রয়োগ করে। প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রীয় আইনকে বলবৎ করা হয়।

কিন্তু হেনরী মেইন (Henry Maine), স্যাভিনি (Savigny), মেটল্যান্ড (Maitland), ফ্রেডরিক পোলাক (Fredrick Pollock), জেমস ব্রাইস (James Bryce) প্রমুখ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে আইনকে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন।[৭] তাঁদের মতে, প্রতিটি দেশে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, লোকচার প্রভৃতি কালক্রমে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই স্যাভিনি বলেছেন, আইন তৈরী করা রাষ্ট্রের কাজ নয়, আইনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ করাই হলো রাষ্ট্রের প্রকৃত কাজ।

আমেরিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি উইলসনের সংজ্ঞায় আইন সম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্বক ও ঐতিহাসিক ধারণার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। উইলসনের মতে, আইন হলো মানুষের সেই সকল সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা বা ধ্যান-ধারণার অংশবিশেষ যা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পেছনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং আইন হলো সামাজিক আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সুনির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ রূপ। এই হলো উইলসনের সংজ্ঞার প্রথম অংশের বক্তব্য। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মতবাদের প্রভাব লক্ষনীয়। এই সংজ্ঞার পরের অংশে বলা হয়েছে যে, আইনের পেছনে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সমর্থন আবশ্যক। এ বক্তব্যের মধ্যে অস্টিনের বিশ্লেষণাত্মক ধারণার প্রভাব সুস্পষ্ট।

অধ্যাপক বার্কার বলেন, আইনকে আদর্শ আইন হতে হলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সংগঠন কর্তৃক স্বীকৃত, ঘোষিত এবং প্রযুক্ত হলেই হবে না; বরং তা ন্যায়সম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। তাঁর মতে, আদর্শ আইন দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত- ১. বৈধতা (Validity) ও ২. নৈতিক মূল্য (Moral Values)। আইনের পেছনে সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সমর্থনকে বৈধতা বলে। আর নৈতিক মূল্য হলো এই যে, আইন সামাজিক ন্যায়নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে বার্কার স্বীকার করেছেন যে, আইন বৈধ হলেই সকলে তা মানতে বাধ্য, সে আইনের নৈতিক মূল্য থাক বা না থাক। নীতির ক্ষেত্রে

একটি বিশেষ নিয়মে আইন সমাজের মানুষের মধ্যে পালিত হবে এবং তা হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং নিয়ম ভঙ্গের কোনো আচরণকে এখানে মেনে নেওয়া হবে না। আইনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, এতে আমাদের অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা। আর তা আমরা বুঝে থাকি নীতিমালার আলোকে শাসনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মাধ্যমে- ১.আইনের শাসন (Rule of Law) ও ২. বাধ্যবাধকতা বা বল প্রয়োগ (Rule of force)।

আইনের শাসনের ক্ষেত্রে নীতিমালাগুলো সরকার কতখানি মেনে চলছে এবং জনগণ তার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হচ্ছে এগুলো দেখা হয়। কাজেই আইনের শাসনের সাথে Goodness বা ভালত্ব এবং Justice বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে আইনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের বিষয়টি জড়িত। আইনের সাথে বল প্রয়োগের একটা সম্পর্ক আছে। সাধারণত আমরা মনে করি যে, আইন হচ্ছে জনগণকে রক্ষা করার একটা হাতিয়ার। তাই আইনের সাথে জনগণের আশা- আকাংঙ্খাও জড়িত থাকে। যেমন-কেউ যদি বিধিবহির্ভুত কোনো আচরণ করে তাহলে আমরা আশা করি যে আইন তাকে শাস্তি দিবে অথবা সঠিক পথ দেখাবে। সুতরাং আইন সকলের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু যেখানে নীতিগত আদর্শ না রেখে বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে আইনের শাসন তথা নৈতিক বাধ্যতাবোধ (Moral Obligation) ব্যাহত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, সরকার এমন কিছু কাজ করে যা দেখে মনে হয়, সরকার জোর করে জনগণের ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। কাজটি যদিও সাংবিধানিকভাবে করা হয়, তথাপি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সরকার কাজটির মাধ্যমে আসলে জনগণের ওপর বল প্রয়োগ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সরকার অনেক সময় আইনের নামে জনগণের ওপর বল প্রয়োগ করেন। আইনের সাথে যদি বল প্রয়োগ ব্যাপারটি জড়িয়ে যায় তাহলে জনগণ সেখানে প্রতারণার স্বীকার হয়। কাজেই আইনের সাথে নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও থেকে যায়। আইনের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় আলোচিত হয়- প্রথমত: আইনকে আইন হিসেবে মানা হচ্ছে কিনা। দ্বিতীয়ত: যদি আইনকে সেভাবে মানা না হয় তাহলে সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন জড়িয়ে যায়।

আইন এমন কতগুলো নিয়মের সৃষ্টি যা সমাজ তার মঙ্গলার্থে অত্যাবশ্যক মনে করে এবং যা পালন করার জন্য সৃষ্ট বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরী করতে ইচ্ছুক। সামাজিক নিষ্ঠা, সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে যেমন সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, একই নিয়মে আইনেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই

রাষ্ট্রীয় আইন অপরিবর্তনশীল নয়। পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এর সৃষ্টি হয়। আইন গতিশীল এবং দেশকাল ভেদে পরিবর্তনশীল। এজন্য ফ্রিডম্যান বলেন,"সামাজিক নির্দেশনার সকল ক্রিয়াবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হলে আইনকেও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে হবে।"[৮]

মার্কসবাদীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনকে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কস-এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন, "যে সব ব্যক্তি শাসন করে, তারা কেবল রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা সংগঠিত করেনা, তারা... নিজেদের ইচ্ছাকেই সর্বজনীন ইচ্ছা হিসেবে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা বা আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।"[৯] ভিশিন্স্কী[১০] (Vyshinsky)-এর মতে, আইন হলো সেসব আচরণবিধি, যা সমাজের প্রতিপত্তিশালীর শ্রেণীর ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। ভি. তুমানোভ (V. Tumanov) তাঁর লেখা Does Marxism Underestimate Law? নামক প্রবন্ধে বলেছেন, 'আইন হলো এমন একটি সামাজিক অভিব্যক্তি যার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ রচনা করা এবং মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করা...।'[১১] অধ্যাপক ল্যাস্কিও আইনকে সমাজের অধিকারভোগী শ্রেণির স্বার্থবাহী নিয়ম-কানুন বলে চিহ্নিত করেছেন।

সুতরাং সমাজের মানুষের কল্যাণ, অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য গৃহীত বিধি ও নিয়মনীতিকেই আইন বলে। আইন হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, যেখানে মানুষ নিরাপদে তার ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি বিধান ও সামাজিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। আইন যখন মানুষে-মানুষে, বিভেদ সৃষ্টি করেনা তখন আইন তার স্বীয় মহিমায় মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে। এ ক্ষেত্রে আইনের অর্থ ও প্রয়োগের ব্যাপারে সু-বিবেক (Good Conscience), সরল বিশ্বাস (Good Faith) এবং সু-বিচার (Legal Justice) প্রধান্য পায় ।

আইনের উৎস:

সেলমন্ড (Salmond) তাঁর *Jurisprudenci* বইয়ের নবম সংস্ককরণে আইনের দুই ধরনের উৎসের কথা বলেছেন- আনুষ্ঠানিক ও বস্তুগত।

১. আনুষ্ঠানিক উৎস: আইনের কোনো বিধি যা হতে, এর ক্ষমতা ও বৈধতা অর্জিত হয়। সেমন্ডের মতে, সংবিধান ও আদালতের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রের যে ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে, তা-ই আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস।

২. বস্তুগত উৎস: অপরপক্ষে, সেমন্ডের মতে, যা হতে আইনের বৈধতা নয় বরং বিষয়বস্তু অর্জিত হয়, তা-ই আইনের বস্তুগত উৎস। যথা- প্রথা আইনের বস্তুগত উৎস; এর মাধ্যমে আইনের বৈধতা অর্জিত হয় না বরং বিষয়বস্তু অর্জিত হয়।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আইনের উৎপত্তি হয়েছে। অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইন, প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ন্যায়নীতি ও আইন প্রণয়ন হচ্ছে আইনের উৎস।[১২] হল্যান্ড ও উইলসনকে অনুসরণ করে আইনের নিম্নলিখিত উৎসগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. প্রথা: সমাজের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এবং লোকাচারকেই প্রথা বলে। প্রথাই হলো আইনের প্রাচীনতম উৎস। প্রথা/আচার-আচরণ জনসমর্থন অর্জন করতে সমর্থ হলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে সেগুলো আইনের মর্যাদা লাভ করে। আধুনিককালেও প্রতিটি রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে প্রথাগত আইনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে হিন্দু ও মুসলমানদের আইনের কথা বলা যেতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান আইনের অনেক কিছুই পূর্বে প্রথা হিসেবে পালিত হতো। তাছাড়া যুক্তরাজ্যের সংবিধান প্রধানত অলিখিত হওয়ায় সেখানে প্রথাগত আইন ও শাগণতান্ত্রিক রীতিগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

২. ধর্ম: প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারাই শাসিত ও পরিচালিত হতো। তখন ধর্ম ও আইনের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নিরূপণ করা হতো না। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুশাসন কালক্রমে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। হিন্দু আইনের ওপর মনুসংহিতার এবং মুসলমান আইনের উপর কোরআনের প্রভাব সর্বজনবিদিত। সুতরাং আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে ধর্মের ভূমিকাকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না।

৩. বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত: আগেকার দিনের সমাজব্যবস্থায় গোষ্ঠীপতি, জ্ঞানী-গুনী ও বর্ষীয়ান ব্যক্তিরাই সমাজের দ্বন্দ্ব-বিবাদের মীমাংসা করতেন। প্রথা ও ধর্মের অসম্পূর্ণতার কারণে তারা আপন বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করতেন। ভবিষ্যতে এই সমস্ত বিচারের রায় আইন হিসেবে গণ্য হতো। পরবর্তী সময়েও বিচারকগণের ঐ রায় ও ব্যাখ্যা অনুরূপ মোকাদ্দমার মীমাংসার ক্ষেত্রে নজির হিসেবে গণ্য হতো।

৪. ন্যায়নীতি: ন্যায়নীতি আইনের অন্যতম উৎস বলে বিবেচিত হয়। ন্যায়নীতি বলতে সাম্য, সততা ও বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিচার করাকে বোঝায়। কোনো বিশেষ ধরনের মামলা সম্পর্কে আইনের কোনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নেই কিংবা কোনো প্রচলিত আইন সমাজের ন্যায়নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে এরূপ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মামলার রায় দেন। ফলে নতুন আইন সৃষ্টি হয়।

৫. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা: আইন সম্পর্কিত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আলোচনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আইনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য হয়। বিগদ্ধ ব্যক্তিদের ভাষ্যের ভিত্তিতে নতুন আইন ব্যবস্থা বিকশিত হয়। উদাহরণ হিসেবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরি ও কেন্ট, ইংল্যান্ডের ব্ল্যাক স্টোন, কোক, হেলো প্রমুখ পন্ডিতদের ভাষ্য উল্লেখযোগ্য।

৬. আইন প্রণয়ন: আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নকে আইনের সর্বপ্রধান উৎস বলে গিলক্রিস্ট প্রমুখ মনে করেন। আইনসভার সদস্যগণ জনমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে আইন প্রণয়ন করেন। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধির সঙ্গে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রথা, ধর্ম প্রভৃতির মতো আইনের উৎসগুলোর গুরুত্ব ক্রমে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

৩.২: আইন সম্পর্কে রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তা

অধিকারের ধারণা যেমন অতি প্রাচীন, তেমনি অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন আইন, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, সমতা ইত্যাদিও চিরন্তন। প্রাচীনকাল থেকে আইন কীভাবে মানবাধিকারের সংরক্ষক হিসেবে রাষ্ট্র দার্শনিক ও নীতিদার্শনিক চিন্তায় স্থান দখল করে আছে নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো ঃ

৩.২.১ রোমান আইন তত্ত্ব (Romam theory of law):

রোমান রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান ও সবচেয়ে আকর্ষনীয় অংশ হলো আইন সম্পর্কিত ধারণা। একটি সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ আইনের ধারণাকে প্রকাশ করে রোম প্রাচীন বিশ্বে রীতিমতো আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আইন সম্পর্কে একটি বাস্তব এবং যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা রোমানরাই সর্বপ্রথম উপস্থিত করেছিল। রোমানরা সর্বপ্রথম আইনকে সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করেছে। আইনকে ধর্ম ও নীতির বাঁধন থেকে মুক্ত করে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার তাৎপর্য কী, রোমানরা তা আমাদের বুঝিয়েছে। আইন যে একটি বিশ্বজনীন ধারণা একথাও প্রচার করেছে রোম। একটি রাষ্ট্রের মধ্যেই নয়, রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আইনকে প্রসারিত করা যায় রোমানরা সেই ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছে। রোমান আইনতত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আইনকে প্রকৃতিজগতের তথা বিশ্ব প্রকৃতির একটি ইচ্ছা ও যুক্তির বাস্তব প্রকাশ হিসেবে উপস্থিত করা। রাষ্ট্র আইনগত অধিকারের উৎস হলেও রোমানরা বিশ্বাস করত জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের উৎস। রোমান আইনকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। এগুলো হলো-প্রাকৃতিক আইন (Law of nature), পৌর আইন (Civil law) এবং সর্বজনীন আইন (Universal law)

প্রাকৃতিক আইনের ধারণাটি রোমানরা গ্রহণ করছিল স্টোয়িক বা নির্বিকারবাদী দার্শনিকদের ভাবধারা অনুসরণে। রোমান পন্ডিত সিসেরো তার *Laws* গ্রন্থে স্টোয়িকদের অনুসরণে প্রাকৃতিক আইনকে ইশ্বরের সাম্রাজ্যের বিধান বলে মনে করেছেন। ইশ্বরের ইচ্ছা এবং মানুষের যুক্তিবাদ ও সমাজমুখী মননই এই আইনের উৎস। সিসেরোর ভাষায়- "এ আইন সত্য, কারণ তা সঠিক যুক্তির দ্বারা পরিচালিত। এ আইন প্রকৃতির ইচ্ছার অনুসারী, সকল মানুষের উপরই প্রযোজ্য। এ আইন অপরিবর্তনীয়, অভ্রান্ত ও শাশ্বত। এ আইন মানুষকে সঠিক কর্তব্যকর্মের নির্দেশ দেয় এবং ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর কার্য থেকে বিরত রাখে"।[১৩]

অতীতে প্রথা ও রীতিনীতি আইন হিসেবে পরিগণিত হতো ও রোমানদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করত। পরে আইনকে ইশ্বরের নির্দেশ বলে মনে করা হলেও শেষ পর্যন্ত রোমনরা আইনকে ধর্মের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিয়ে বাস্তবের ওপর স্থাপন করল এবং ঘোষণা করল মানুষই আইনের রচয়িতা। আইনের লঙ্ঘন মানে সার্বভৌম শক্তিকে অগ্রাহ্য করা এবং শাস্তি ডেকে আনা। রোমান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে রোমানগণ আইনের ওপর বিশেষ নজর দিতে আরম্ভ করে এবং আইনকে নাগরিকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবে রোমে পৌর আইন গড়ে ওঠে।

সর্বজনীন আইন হলো বিশ্বসাম্রাজ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনে উদ্ভূত আইন। বিশেষ দেশ বা জনগোষ্ঠীর জন্য নয়, এ আইন বিশ্বরাষ্ট্রের উপযোগী এক সর্বজনীন আইন। রোম সাম্রাজ্য এবং রোমের অধীনস্থ প্রদেশগুলোকে একই শাসন সূত্রে আনা এবং রোমের ঐক্য ও সংহতিকে প্রতিষ্ঠিত করার বৃহত্তর স্বার্থে গড়ে ওঠে ছিল এ আইন। ন্যায়বিচারের নীতি এ আইনে প্রতিফলিত, সমস্ত প্রদেশগুলোর ক্ষেত্রে এই আইন সমভাবে প্রযোজ্য। ভেদনীতি নয়, সমতাই এ আইনের ভিত্তি। রোমের শান্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সার্বিক প্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতীক এ আইন। ন্যায়বোধ ও স্বাভাবিক যুক্তির দ্বারা তা প্রচলিত। রোমান চিন্তা রাজনীতির ব্যবহারিক চিন্তাকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সর্বজনীন আইন ও প্রাকৃতিক আইনের মৌলিক প্রভেদ তুলে ধরা, পৌর আইন বা দেশীয় আইনের তুলনায় সর্বজনীন আইন অধিক কাম্য, এসব রোমান চিন্তার দ্বারাই আমরা আলাকিত হই। রোমান চিন্তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো আইনের সঙ্গে সমতা, স্বাধীনতা ও মানবিকতার ধারণাকে যুক্ত করা।

৩.২.২ আইন ও আন্তর্জাতিক আইন প্রসঙ্গে গ্রোসিয়াস (Grotius on international law)

আন্তর্জাতিক আইনবিদ অধ্যাপক হল্যান্ড জেনটিলিসকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে পরিচয় দিতে চাইলেও ওপেনহাইম গ্রোসিয়াসকেই 'আন্তর্জাতিক আইনের জনক'[১৪] (Father of international law) হিসেবে সম্মানিত করেছেন। গেটেল মনে করেন, সব রকমের পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থেকে সম্পূর্ণ মানবিক ও যুক্তিযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে ব্যাখ্যা করা এবং সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার কৃতিত্ব গ্রোসিয়াসেরই প্রাপ্য।[১৫]

মানবপ্রকৃতি ও যুক্তির মধ্যেই যে আরও একটি উর্ধ্বতন আইনের অস্তিত্ব আছে এবং এই আইনই যে প্রাকৃতিক আইন বা স্বাভাবিক আইন গ্রোসিয়াসই তা বিধিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ আইনের মধ্যেই যে জাতিসমূহের আইন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের সূত্র সন্ধান করা যায় এ কথা প্রচার

করে গ্রোসিয়াস শুধু আন্তর্জাতিক আইনেরই নয়, প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইনেরও প্রথম বক্তা বা জনক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারেন।

ন্যায় ও সুবিচার রক্ষা করাই যে মানুষের তথা রাষ্ট্রসমূহের কর্তব্য, যুদ্ধ এবং পারস্পরিক হানাহানি যে শান্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়, রাষ্ট্রসমূহকে যে শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হতে হবে, *The Law of War and Peace* বইটির উৎসর্গপত্রে গ্রোসিয়াস সে কথা উল্লেখ করেছেন। নিজ শক্তি বা বিধিবদ্ধতার গুণেই যে আইন কার্যকর হয় বা আইনের সঙ্গে নৈতিকতার যে কোনো সম্পর্ক নেই গ্রোসিয়াস এমন কথা তিনি বলতে চাননি। গ্রোসিয়াস বিশ্বাস করেন শক্তির গুণেই যে আইন কার্যকর হয় তা নয়, মানুষ নিজের ইচ্ছায়ও আইনকে মেনে চলে। ইশ্বরের আশির্বাদ লাভ করবে জেনেই মানুষ অন্যায় করে না। সুতরাং মানুষের নৈতিকতাই আইনের বৈধতা।

গ্রোসিয়াস প্রাচীন ও মধ্যযুগের তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা থেকে সরে এসে স্বাভাবিক আইনের একটি বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি উন্নত উদীয়মান সমাজের দৃষ্টি দিয়ে এ আইনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের আদেশ বা ইচ্ছার সমষ্ঠি হিসেবে চিহ্নিত না করে স্বাভাবিক আইনকে তিনি যুক্তির প্রকাশ বা প্রতিফলন হিসেবে দেখেছেন। গ্রেসিয়াসের ভাষায় স্বাভাবিক আইন হলো "সঠিক যুক্তির নির্দেশ, যা কোনো ইচ্ছার পরিবর্তে মানব প্রজ্ঞার উৎপন্ন ফল।"[১৬] এ আইন প্রকৃতির নীতি অর্থাৎ যা স্বাভাবিক যা যুক্তিসঙ্গত তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করেই চলে। সম্ভবত এই কারণেই নৈতিক প্রয়োজন এবং সুবিচারের ধারণার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ্রোসিয়াস রাষ্ট্র বলতে বুঝেছেন স্বাধীন লোকদের একটি পূর্ণ সংস্থা, যা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আইন পালন ও সাধারণ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে।[১৭] তিনি রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেবতা বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে মানুষের ইচ্ছা, আবেগ বা অধিকারবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক আইন বলতে গ্রোসিয়াস যা বুঝেছেন তা হলো সমস্ত বা অধিকাংশ জাতির ইচ্ছাক্রমে জাতিসমূহের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত আইন। রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি বা অনুমোদনই এ আইনের ভিত্তি। গ্রোসিয়াস বিশ্বাস করেন দেশের আইনের মতোই আন্তর্জাতিক আইনও বাধ্যতামূলক; প্রথমটি মানুষের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়টি জাতির ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক আইনকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটিকে তিনি বলেছেন Jus Voluntarium অর্থাৎ রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আইন বা প্রথাগত

আইন এবং দ্বিতীয়টি হলো Jus Natural অর্থাৎ রাষ্ট্রিক আইন, জাতিসমূহের স্বাভাবিক আইন। আন্তর্জাতিক আইন ন্যায়ের স্বাভাবিক নীতিকে অনুসরণ করে। যুক্তি ও নৈতিকতাকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রসমূহের আচরণ নির্ধারণ করে এ আইন। গ্রোসিয়াস যুদ্ধ বলতে বুঝেছেন রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি-সশস্ত্র সংগ্রাম। ন্যায় এবং অন্যায় এই দুইভাগে যুদ্ধকে ভাগ করে তিনি বলেছেন, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোনো জনগোষ্ঠী যখন যুদ্ধ করে তখন তা স্বাভাবিক আইনের বিরোধী নয়; সুতরাং তা ন্যায়। অপরের অধিকার লঙ্ঘন করে, অপরের ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ হরণের প্রচেষ্টা, অপর জাতিকে দাস বানানোর স্বার্থপর প্রচেষ্টাকে গ্রোসিয়াস বলেছেন অন্যায় যুদ্ধ।

এভাবে গ্রোসিয়াস আন্তর্জাতিক আইনের যে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে ছে গ্রোসিয়ানপন্থী মতবাদ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে মতবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনিই প্রচার করেছেন একই সঙ্গে স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত আইনের তাৎপর্য।

৩.২.৩ লকের আইনগত অধিকার (Locke on legal rights):

উদারতাবাদী দার্শনিক লক রাষ্ট্রশক্তির শাসনাধিকারকে মানবিক অধিকার ও সামাজিক স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। ক্ষমতাশালীকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা যে লকের পূর্বে হয়নি তা নয়, তবে লক-ই নিয়ন্ত্রিত শাসনের ধারণাকে রাষ্ট্রতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজনীতি শাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রশাসনের রূপকার হিসেবে।

লকের মতে, প্রাকৃতিক আইন সেই নিয়মের সমষ্টি যা সর্ব যুগে সর্বক্ষেত্রে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ আইনের বিচারক হলো প্রজ্ঞা, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সমানাধিকার প্রাজ্ঞ আইনের সৃষ্টি। সমানাধিকারের এই ধারণা থেকেই এসেছে আত্মরক্ষা, অধিকারবোধ ও মানবিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রশ্ন। প্রকৃতির রাজ্যে নিজের সুখ ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করাই ছিল স্বাধীনতার লক্ষ্য। কিন্তু এই স্বাধীনতা কখনই অপরের অধিকার ও সুখ কেড়ে নেওয়ার, অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রদর্শনের স্বাধীনতা নয়-এ স্বাধীনতা হলো সামাজিক স্বাধীনতা-সকলের মিলেমিশে, শান্তিতে, সুখে বসবাস করার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আসে মানুষের শৃঙ্খলাবোধে, আইন মেনে চলার শর্তে। এ আইন মানুষের সৃষ্ট আইন। এ আইন স্বাধীনতার সংকোচন নয়, স্বাধীনতা প্রসারে কার্যকরী।[১৮]

লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে সকল মানুষ সকল মানুষের সঙ্গে লড়াই করেনা। প্রকৃতির রাজ্য হলো শান্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংরক্ষণের অবস্থা। এ রাজ্যে অধিকার কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত, স্বাধীনতা ও আইন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। লক তাঁর *Two Treatises of Government* এ দেখান, মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলো অর্থাৎ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ক্ষুন্ন করার কোনো অধিকারণ সার্বভৌমের নেই। মানুষ সার্বভৌমকে ক্ষমতা প্রদান করেছে নিছক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়, তার অধিকারকে সুরক্ষিত ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে। প্রকৃতির রাজ্যে যা ছিল পরস্পরের কাছে দাবি, রাজনৈতিক সমাজে সেই দাবিই মানুষ রেখেছে রাষ্ট্রের কাছে। এ দাবি হলো তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার দাবি, ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত সুবিধাগুলোকে সুরক্ষিত করার দাবি। এ দাবিকে মেনে নেওয়ার ওপরই নির্ভর করবে রাজনৈতিক সমাজ তথা রাজনৈতিক সার্বভৌমের প্রতি তার আস্থা ও আনুগত্য। নিজের যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা, নিজের বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করার এবং সুখী ও উন্নত জীবনের সুযোগ ও সুবিধাকে গ্রহণ করার মধ্যে দেখেছে মানবকল্যাণের প্রকৃত পথ। রাজনৈতিক সমাজে মানুষ সম্মিলিতভাবে নিজেদের সম্মতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করল সেই বৈধ কর্তৃত্বের। নিজেদের জীবন, স্বাধীনতা, শাসনাধিকার প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হলো এই কর্তৃপক্ষকে।

লকের মতে, সম্পদ সচেতন, ভোগী হলেও মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ন্যায়বোধ ও সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বা অপর মানুষের স্বার্থের পক্ষে হানিকর কোনো চিন্তা বা কর্মে সে উৎসাহী নয়, নিজের স্বার্থের সঙ্গে অন্যের স্বার্থকে মেলাতে, নিজের শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অপরের শান্তি ও নিরাপত্তাকে মেলাতে চায় সে। লকের কাছে মানুষের পরিচয় ব্যক্তি বিশেষ হিসেবে নয়, সমগ্র মানবজাতির অঙ্গ হিসেবে। স্বাভাবিক অবস্থায় লকের মানুষ সমতার অবস্থাতেই সমগ্র মানবজাতির পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা, তার উপভোগ, শান্তি ও নিরাপত্তার উপযুক্ত অবস্থা বলে ভাবতে শেখে। রাজনৈতিক সমাজে মানুষের পরিচয় নাগরিক হিসেবে, যে অধিকার ভোগ করবে, কর্তব্যপালন করবে, নিয়ম ভঙ্গ করলে শাস্তি পাবে, আবার অধিকার ব্যাহতো হলে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ করবে।

লক ব্যক্তি হিসেবে মানুষের অধিকারের সমতার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন প্রত্যেকের অধিকার স্বীকৃতি পেলেই ব্যক্তিগতভাবে মানুষের অধিকার উপভোগের প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় নৈতিক দিক থেকে সকলেই সমান, প্রত্যেকেই তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। যুক্তিবোধ মানুষকে আইনের অনুগত করে, কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত করে।

প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রে মানুষ পৌঁছাতে চেয়েছে দুটি কারণে (১) প্রতিষ্ঠানগত কারণ অর্থাৎ সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তাগিদ যা মানুষকে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ রাখবে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে আইন প্রতিষ্ঠার, আইন প্রতিপালন ও বিরোধের মীমাংসা ও শাস্তিদানের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান মানুষ পেল, (২) উদ্দেশ্যগত কারণ অর্থাৎ নতুন রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব নাগরিকের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে তার জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষা ও সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে। অধিকাংশ মানুষের আস্থা ও সমর্থন রাষ্ট্রের প্রতি। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন বা সর্বক্ষমতাধর নয়, জনসাধারণ যতটুকু ক্ষমতা এর হাতে অর্পণ করেছে ততটুকুই এর ক্ষমতা। রাষ্ট্রের কার্যাবলী জনগণের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

স্যাবাইন[১৯] মনে করেন, ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত সামাজিক মতবাদ গড়ে তোলার ঝোঁক লক-এর সময় ছিল এবং স্বাভাবিক বিধান (আইন) তত্ত্বকে একদিকেই ব্যবহার করার প্রবণতাটি ছিল এবং লকও এই প্রবণতাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। লক স্বাভাবিক আইনকে ব্যক্তির স্বাভাবিক ও অখন্ড অধিকারের দাবি হিসেবেই উপস্থিত করেছেন। ফলে লকের তত্ত্ব অহংবাদী বলে মনে হয়। স্যাবাইনের মতে, লকের তত্ত্বে ব্যক্তি ও তার অধিকার যেমন এসেছে আবার সমাজ ও সরকারের ভূমিকার কথাও তেমনি এসেছে। অথচ কেমন করে উভয়ই চূড়ান্ত হতে পারে তার কোনো স্পষ্ট বিশ্লেষণ তিনি দিতে পারেন নি। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও বলা যায়, লকের রাজনৈতিক তত্ত্ব তাত্ত্বিক গুণে অবশ্যই উত্তীর্ণ। তাঁর চুক্তি ও সম্মতির তত্ত্ব, জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণা, ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় অধিকারের কথা এখনও প্রগতিশীলতার নজির হিসেবে পেশ করা হয়।

৩.২.৪ রুশোর চিন্তায় আইন (Rousseau on law):

প্রকৃতির রাজ্যের শান্তি ও স্বাধীনতাকে কীভাবে রাজনৈতিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কোনো আইন ও সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও স্বাধীনতা, তা রুশোর আইনতত্ত্বে স্থান পেয়েছে। রুশোর মতে, আইনের মধ্যেই প্রকাশ পায় সর্বসাধারণের ইচ্ছা বা শক্তি। চুক্তি রাষ্ট্রদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, এই দেহকে সচল ও জীবন্ত রাখতে হলে প্রয়োজন আইন প্রণয়ন। রুশোর কথায়, মানুষ যদি সৎ ও সুশৃঙ্খল হতো তবে কোনো সরকার বা আইনের দরকার হতো না। মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ থাকতে পারে, কিন্তু তাকে কার্যকর করা দরকার। আইনই এখানে ন্যায়দন্ডের কাজ করবে অর্থাৎ ন্যায়বোধকে সুপরিচালিত করবে, তাকে কার্যকর করবে। অবশ্যই সেই ন্যায়বোধকেই আইন রক্ষা করবে যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। মানুষের অধিকারের সঙ্গে তার কর্তব্যের, ন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়বিচারের

উদ্দেশ্যের সংগতি স্থাপনের জন্যই আইন প্রণয়ন করা দরকার। প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে সমাজবদ্ধ জীবনের অবস্থাটি ভিন্ন। প্রাকৃতিক অবস্থায় বস্তুর কোনো মালিকানা থাকে না বলে তা সকলেরই ভোগ্য। সুতরাং এ অবস্থায় কাউকে কিছু দেওয়ার বা কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়ার থাকে না। সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের অনুভূতি উন্নত হয়, তার সামর্থ্য বিকশিত হয়, তার বোধশক্তি প্রসারিত হয়, স্বভাবতই তার প্রত্যাশাও বৃদ্ধি পায়। কোনো ব্যক্তিমানুষের নয়, সকল মানুষের, মানব সমাজের প্রত্যাশাকে পরিতৃপ্ত করতেই প্রয়োজন হয় আইনের।

রুশোর মতে, আইন হলো সর্বসাধারণের ইচ্ছার ফল। সকল মানুষ যখন সকল মানুষের ওপর আদেশজারি (Decree) করে তখন তার বিচারের বস্তু কিন্তু সে নিজেই। অর্থাৎ সকল মানুষ সমস্ত জাতির হয়েই আইন প্রণয়ন করছে। রুশো বলেন, "সাধারণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলে গিয়ে সকলের ইচ্ছা যখন সকলের উপরেই আদেশ হিসেবে জারি হয়, তখন তাকে বলে আইন।"[২০]

সুতরাং আইন কোনো একজন লোকের অনুজ্ঞা বা আদেশ নয়, আইন হলো সকলের প্রয়োজনেই সকলের ওপর সকলের আদেশ। এ আইন উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাধারণ, কোনো নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্বার্থে পরিচালিত হবে না। এ আইন সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আসেও সবার কাছ থেকেই। রুশো বলেন, আমি যখন বলি আইন সামগ্রিক বা সাধারণের তখন তার অর্থ এই যে আমরা এখানে কোনো বিশেষ বক্তি বা বিশেষ কার্যকে বুঝি না, আমরা বুঝি প্রজাদের সমষ্টিকে বা তাদের সমগ্র কর্মনীতিকে। এক কথায়, যে কাজে কোনো ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, সে কাজ আইনের এক্তিয়ার বহির্ভূত। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে যে আইনের অনুমোদন করেনা সে আইন কখনো আইন নয়।

যে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা পরিচালিত সেই রাষ্ট্রই প্রজাতন্ত্র, কারণ এক্ষেত্রে প্রজাদের স্বার্থই দেশের স্বার্থ, প্রজারাই এখানে সার্বভৌম, প্রজাদের সম্মতি নিয়েই প্রজারা ঠিক যেমনটা চায় সেভাবেই এখানে শাসন পরিচালিত হয়। সাধারণের বুদ্ধিকে মার্জিত করে তোলায় তাদের সঠিক পথে চলার প্রেরণা দেন যিনি, তিনিই আইন প্রণেতা। আইন প্রণেতাই ব্যক্তির বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করে শোধন করে নিতে এবং জনসাধারণকে কিসে তার কল্যাণ তা বুঝে নিতে সাহায্য করেন, ব্যক্তির ইচ্ছা ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সমাজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিয়ে, ব্যক্তির শক্তিকে সমাজের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজদেহকে করে তোলেন অপরাজেয়।

রুশো আইনের দ্বারা শাসিত সরকারকে সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলেন, এর মধ্যেই লক্ষ্য করেন গণতান্ত্রিক সরকারের এবং সার্বভৌমিকতার উপস্থিতি। তাঁর মতে, সাধারণের ইচ্ছা যতই সাধারণের হবে ততই তার সার্বভৌত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। সাধারণের ইচ্ছা যদি সাধারণের দাবিকে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করে , তবে তা আর সাধারণের ইচ্ছা বা সার্বভৌম থাকে না। সুতরাং রাষ্ট্রকে সেভাবে সংগঠিত করতে হবে যেখানে সকল নাগরিকই একটি সুসংবদ্ধ, সুসংহত নাগরিকমন্ডলী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সে নাগরিকমন্ডলীই সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ এবং সার্বভৌম। রুশো সাধারণের ইচ্ছা ধারণাটিকে সামগ্রিক ধারণা হিসেবে উপস্থিত করলেও ব্যক্তির স্বাধীনতা বা ইচ্ছাকে এর কাছে সমর্পণ করতে বলেননি অর্থাৎ ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা যে সার্বভৌমের অধিকার এবং ক্ষমতা থেকে পৃথক এ কথা বলতে চেয়েছেন।

রুশো সার্বভৌম বা রাজা এবং সরকারের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে প্রজা একাধারে প্রজা ও সার্বভৌম। সুতরাং প্রজা হিসেবে মানুষের অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয় সে জন্যই তিনি চেয়েছেন সুনিয়ন্ত্রিত সরকার। অন্যদিকে সার্বভৌম হিসেবে প্রজার নির্দেশ ও সম্মতি মেনেই যাতে সরকার কাজ করে সে দিকেও তার দৃষ্টি ছিল। শক্তির ভারসাম্য রক্ষাও রুশোর লক্ষ্য ছিল। সার্বভৌম, প্রজা ও সরকারের অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি সমানুপাতি সম্বন্ধ থাকুক, ক্ষমতার ভারসাম্য থাকুক সেটাও তিনি চেয়েছিলেন। সরকারকে তিনি একদিকে রাজা ও অন্যদিকে প্রজা উভয়ের সঙ্গে একটি আনুপাতিক সম্বন্ধ রেখে চলার পরামর্শ দেন।

৩.২.৫ হেগেলের আইনতত্ত্ব (Hegel's theory of law)

হেগেল তাঁর *Philosophy of Law* এবং *Philosopy of Right*[২১]গ্রন্থদ্বয়ে আইন এবং অধিকারের নির্ধারক হিসেবে আইনকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, আইন একটি ভাব বা আদর্শ। আইনকে তিনি স্বাধীন ইচ্ছার বিদ্যমান অস্তিত্ব হিসেবেই দেখেছেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতার সঙ্গে আইনের কোনো পার্থক্য নেই। স্বাধীনতার একটি বিশেষ রূপ হিসেবে তিনি যেমন আইনকে দেখেছেন আবার প্রচলিত ধারণাকে সামনে রেখেও আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

হেগেল বিশ্বাস করেন আইন ব্যবস্থা হলো কার্যক্ষেত্রে স্বাধীনতার রাজত্বের রূপায়ণ, বিশেষ আইন হলো বিশেষ ক্ষেত্রে যে আইন কার্যকর হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র সবক্ষেত্রেই বিশেষ আইনের প্রকাশ আছে। এগুলো কখনও সীমাবদ্ধ, কখনও পরস্পর বিরোধী, আবার কখনও পরস্পর

নির্ভরশীল। সাধারণভাবে আইন বলতে হেগেল যা বোঝেন তা পরিপূর্ণরূপ লাভ করে রাষ্ট্রে। পৌরসমাজের আইনের যে অসংগতি আছে, রাষ্ট্রিক আইনে তা নেই। পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ আইন জনসাধারণের কাছে আনুগত্য পায়, কারণ এ আইন তার কাছে কোনো বাইরের ব্যাপার নয় বা এ আইন তার ওপর চাপানো কোনো নিয়ম নয়। এ আইনের প্রতি সে অনুবর্তী সম্পূর্ণ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়। ব্যক্তি চায় সেই শক্তি বা প্রেরণার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে। এটা সম্ভব যখন ব্যক্তি কোনো স্বার্থ বা কামনা বাসনার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, রাষ্ট্রের ইচ্ছার সঙ্গে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেয়। এখানেই তার স্বাধীন ইচ্ছা মূর্ত হয়ে ওঠে। পরম ইচ্ছা তথা রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে চললেই এই স্বাধীন ইচ্ছাকে কার্যকর করা সম্ভব। আইন এই পরম ইচ্ছার অর্থাৎ রাষ্ট্রের ইচ্ছারই বাস্তব প্রকাশ। কোনোরকম ভয়ভীতি নিয়ে রাষ্ট্রের ইচ্ছার অধীন হলে ব্যক্তি স্বাধীন বলে গণ্য হবে না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা তথা আইনকে ব্যক্তি সচেতনভাবেই মেনে নেবে এবং ব্যক্তিকে এই বিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে যে, রাষ্ট্র যা চায় সেও তাই কামনা করে।

আইন বিষয়ে হেগেলের চিন্তার অনন্য দিক হলো- আইন মূর্ত হয়ে ওঠে আইনের বিধানগুলোর মাধ্যমে। এগুলোই আইনকে একটা সার্বিক, সর্বজনগ্রাহ্য, সুনির্দিষ্ট রূপ দেয়। আইনের সংকলন বা লিপিবদ্ধকরণ, সুবিন্যস্ত প্রকাশ একান্ত বাঞ্চনীয়। মানবিক সম্পর্কের বাইরের বিষয়গুলোই আইনের দ্বারা প্রভাবিত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র নয়। আইনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জাতীয় চরিত্র ও তার ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায়গুলো। আইন যখন আইনের রূপ পরিগ্রহ করেনি, যখন আইন ব্যক্তির সামর্থ্যেই, তাঁর চেতনাতেই রূপ নিচ্ছে তখন আইন হলো বিমূর্ত। এ পর্যায়ে ব্যক্তি নিজেই এক অনুশাসন তৈরি করে নিচ্ছে এবং নিজের ও অপরের ক্ষেত্রে তা মান্য করে চলছে। হেগেল মনে করেন, ব্যক্তির সম্পত্তি চুক্তির স্বাধীনতাকে রূপ দেয়। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে কার্যকর করাই আইন। জীবন্ত কোনো প্রাণী তখনই ব্যক্তি বলে গণ্য হবে যখন এর মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে। কোনো বস্তু সম্পদ কারণ তা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা ও নৈতিকতা থেকে সরিয়ে আনা অন্যায়। এভাবে হেগেলের চিন্তায় আইনের সাথে নৈতিকতাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। হেগেল Social Ethics ধারণাটিকে প্রচার করেছেন এবং বলেছেন সামাজিক নৈতিকতার মধ্যেই আছে স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃত উপলব্ধি।

আন্তর্জাতিক আইনকে হেগেল এক ধরণের বাধ্যবাধকতা বলেই মনে করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছার ওপরই এই বাধ্যবাধকতার প্রকৃত অবস্থাটি নির্ভর করবে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছার ওপর

কোনো সর্বোচ্চ আইন বা বিচারক নেই। রাষ্ট্রের চেতনা বা নৈতিকতাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করে। হেগেলের মতে, রাষ্ট্রই ঐক্যের আধার।[২২] হেগেল ছিলেন জাতীয় রাষ্ট্রের সমর্থক। রাষ্ট্র বলতে তিনি জাতীয় রাষ্ট্রকেই বুঝিয়েছেন। জাতীয় রাষ্ট্র হলো সেই চেতনা যা স্থায়ীভাবে যুক্তির এবং তাৎক্ষনিকভাবে বাস্তব প্রকাশ এবং এই বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রকে পৃথিবীতে চরম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হেগেলের রাষ্ট্র বিমূর্ত রাষ্ট্র, পৃথিবীতে শক্তি বা প্রেরণার চুড়ান্ত প্রকাশ। এ রাষ্ট্র সমগ্র যা অংশকে পরিপুষ্ট করে। এ রাষ্ট্র নৈতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং নৈতিকতা এ রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি। রাষ্ট্রের কাছে তার নিজের স্বার্থ, নিজের কল্যাণই বড়ো। ব্যক্তি এ রাষ্ট্রের ইচ্ছার অধীন ও অনুগত। ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতা এ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপরই নির্ভরশীল। সত্য-মিথ্যার চুড়ান্ত বিচারক রাষ্ট্র নিজেই। রাষ্ট্র যা ভালো বিবেচনা করে সেটাই মহৎ, সত্য। রাষ্ট্র যা অন্যায় মনে করে সেটা মিথ্যা।

৩.৩ আইনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্কঃ

জীবনের একটি বিষয়ের সাথে যেমন অন্যান্য অনেক বিষয় জড়িয়ে যায়, আইনের ক্ষেত্রেও তেমনি নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি জড়িয়ে পড়ে কারণ এখানে যে নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ঔচিত্যের (ought) বিষয়টি নিহিত থাকে। উচিত শব্দটি আইনের সাথে জড়িত। এই নীতি কেউ ভঙ্গ করলেও সে মনে মনে এই বিষয়টি উপলব্ধি করে যে, সে কাজটি ঠিক করেছে কিনা বা সে নিয়ম নীতি ভঙ্গ করেছে কিনা। অন্যদিকে সুশাসনের পরিবর্তে যদি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেখানে নিয়ম-নীতি ভঙ্গ হয়, ফলে কাজটি অনৈতিক হয়ে পড়ে। কাজেই আইনের খাতিরেই শুধু আইন নয়, এর সাথে নৈতিকতা বিষয়টিও জড়িত হয়ে যায়। যেমন- চিকিৎসাবিদ্যা ও ক্লোনিং বিজ্ঞান এর ক্ষেত্রে এ ব্যপারগুলো লক্ষণীয়।

রাজনৈতিক আইন ছাড়া সমাজব্যবস্থায় আরো কতকগুলো বিধিনিষেধ থাকে যার দ্বারা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলোকে নৈতিক বিধি বলে। প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিক বিধানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। প্লেটো-এরিস্টটলের আমলে আইনসমূহ নীতিশাস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক বিধান উভয়েরই উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু, সুসংবদ্ধ, ও শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবন সম্ভব করা। আইন অনেক সময় সমাজের নীতিবোধকে প্রভাবিত করে দেশের নৈতিক অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা করে। আবার নৈতিকতাও রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রভাবিত করে। সমাজের নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়। সেজন্য আইনকে একটি দেশের নৈতিক মানের পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। কোনো দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত হলে তার আইন ব্যবস্থাও উন্নত হয়ে থাকে।

আইনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষণীয়। কেউ কেউ মনে করেন, আইনের মাঝে নৈতিকতার বিষয়টি সম্পৃক্ত হওয়া দরকার। আবার অনেকে মনে করেন এর কোনো দরকার নেই। এক্ষেত্রে দার্শনিকদের দু'টো পৃথক শ্রেণি লক্ষনীয় -

১) প্রকৃতিবাদী দার্শনিক (Natural Philosopher)

২) আইনগত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক (Legal Positivist Philosopher)

৩.৩.১ প্রকৃতিবাদী দার্শনিক

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট প্রাকৃতিক আইন বা Natural Law এর সমর্থক। কান্ট *Critique of Practical Reason*[২৩] এবং *Fundamuntal Principles of the Metaphysic of Morals*[২৪] গ্রন্থদ্বয়ে আইনের সাথে নৈতিকতার বিষয়টি জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেন। আইন সাধারণত আমাদের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তা নিয়ে আলোচনা করে।

'আইন' বলতে কান্ট কি বোঝান তা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, ঝোঁকের বিপরীত হচ্ছে আইন।'[২৫] বস্তুত আইণের নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে তাহলে আমরা ঝোঁকবশত যা করতে চাই তা করতে পারি। আইনকে অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করার অর্থ হলো আমাদের ঝোঁক অনুসারে কাজ করা। আইনকে ঝোঁকের বিপরীত মনে করা হয় এ কারণে যে, ঝোঁক নিয়ন্ত্রণমুক্ত কিন্তু আইন নিয়ন্ত্রিত। নৈতিক কাজ, কান্টের মতে, স্বাধীন কাজ কিন্তু তা বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রিত কাজ। আইন আমাদের আত্মস্বার্থকে দমন করে ও সংযত রাখে, আইনের সাথে ঝোঁকের সম্পর্ক বিপরীত বলতে কান্ট এটাই ব্যক্ত করেন যে ঝোঁক আমাদের কাজকে প্রভাবিত করতে চায়, কাজের লক্ষ্যবস্তুর প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করতে চায় কিন্তু আইন আমাদের ঝোঁকমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। কর্তব্য কাজ তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে ঘটে থাকে।

আইন বলতে কান্ট সর্বজনীন নিয়মকে নির্দেশ করেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তির কাজের নীতি এমন হতে হবে যে তা বিশ্বজনীন আইনে পরিণত হতে পারে। ব্যক্তির ইচ্ছানীতি এমন হবে যে তা সবার জন্য অভিন্ন ইচ্ছানীতি হতে পারে, তবেই তা আইনরূপে গণ্য হবে। সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে অপারগ বলেই 'মিথ্যা কথা বলা' অথবা 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা' আইনের রূপ পেতে ব্যর্থ হয়।

আইনের একটি সাধারণ (general) দিক রয়েছে যা কোনো কোনো কাজকে বা কতগুলো কাজের শ্রেণিকে নির্দেশ করে। কান্টীয় ব্যাখ্যা অনুসারে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে কোনো কাজ করার ইচ্ছা দ্বারা এটাই বোঝায় যে কাজটি এমন নির্দিষ্ট শ্রেণির যে তা সম্পাদন করতে ব্যক্তি বাধ্য অর্থাৎ এ কাজগুলোর মধ্যে বাধ্যবাধকতার বা ঔচিত্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও ইচ্ছাবৃত্তির আদেশকে কান্ট আইন হিসাবে গণ্য করেন। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা। বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তার ইচ্ছাবৃত্তির আদেশ মূলত কোনো শর্তের অধীন নয়। এমন আদেশকে তিনি আইন হিসেবে নির্ধারণ করেন। এমন আইন সমাজ, রাষ্ট্র বা বাহ্যিক চাপমুক্ত আদেশ। এমনকি ঐশ্বরিক আদেশ থেকেও এ আইন স্বতন্ত্র। যে আদেশ প্রতিটি

বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে তা আইন হিসেবে সিদ্ধ। নৈতিক আদেশকে কান্ট নৈতিক আইন হিসেবে স্বীকার করেন। ব্যক্তি নিজেই এ আইনের অধীন, এ আইন স্ব-আরোপিত। কান্ট আইনকে দুইভাগে ভাগ করেন-ব্যক্তিগত আইন ও সাধারণ আইন। ব্যক্তিগত আইন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব হিসেবে লোকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তিগত আইন বৈষয়িক ভোগসুখের প্রশ্নে, ব্যক্তিগত ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রশ্নে কার্যকর। ব্যক্তির সম্পদের ওপর মালিকানার অধিকার থাকতে পারে কিন্তু তা চুক্তিনির্ভর। কান্ট ভূমিদাস প্রথা ও জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন। সাধারণ আইন বলতে তিনি বুঝেছেন সে সব আইন যা ব্যক্তির নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক, বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। কান্ট এর কাছে আইন গুরুত্ব পেয়েছে স্বাধীনতার মূল্যে। তিনি স্বাধীনতার এক সর্বজনীন আইনে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বাধীনতার এই সর্বজনীন আইন অনুসারেই আইন বিভিন্ন মানুষের সেচ্ছাপ্রনোদিত কার্যাবলীকে সমন্বিত করবে।

কান্ট মনে করেন মানুষের স্বাধীনতার দুটি দিক– নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা হলো মানুষের সেই কার্যকলাপ যার পেছনে কামনা বাসনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ইতিবাচক স্বাধীনতা হলো নৈতিকতা মেনে, নীতির অনুজ্ঞা মেনে যে স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করে। *Metaphysic of Morals'* - এ স্বাধীনতা বলতে কান্ট আইনের প্রতি আনুগত্যের কথা বলেছেন, আইন মেনে আচরণ করার কথা বলেছেন।

কান্ট জনসাধারণকেই (Volk) সার্বভৌম এবং সর্বোচ্চ আইন প্রণেতা হিসেবে মনে করেন। *Metaphysic of Morals'* গ্রন্থে রাষ্ট্র বলতে তিনি বুঝেছেন 'আইনের অধীনে বহু মানুষের সংগঠন'। অন্যান্য সংগঠনের মতোই সমাজ তার লক্ষ্য নির্ধারণে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র চুক্তিরই ফল, মানুষ রাষ্ট্র গঠন করে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছে তাঁর অধিকার সুনিশ্চিত করতে।

কান্টের মতে, আইনের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় দেখা যায়, যথা ১) নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও ২) অধিকার (যখন আইন প্রণয়ন করা হয় তখন আইন প্রণয়নকারী আইন শাসনকারীদের কিছু অধিকারও প্রদান করেন)। আর যখনই আইনের সাথে অধিকারের বিষয়টি জড়িয়ে পড়ে তখন এর সাথে নৈতিক বাধ্যবাধকতাও জড়িয়ে পড়ে। তাই কান্ট বলেন, আইনকে যতই আমরা একটা নীতি হিসেবে দেখিনা কেন, এর সাথে নৈতিক বাধ্যবাধকতাও অবশ্যই জড়িত। কেননা আইনের সাথে ন্যায়পরতা, ঔচিত্য, সর্বসাধারণের মঙ্গল প্রভৃতি বিষয়গুলো জড়িত থাকে। তাঁর মতে, নৈতিকতা যদি কাজ না করে তাহলে

আইন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যেমন, চুরি করা পাপ, কারণ চুরি করা নৈতিকতা বিরোধী, তাই চুরি করলে শাস্তি হবে। কারণ কান্টের মতে, আমরা তখনই আইন মেনে চলি যখন সেটার সাথে কোনো না কোনভাবে নৈতিক বাধ্যবাধকতা কাজ করে। *Philosophy of law* গ্রন্থে N.E. Simmonds বলেন, "প্রাকৃতিক আইন তত্ত্ব দাবি করে যে, আইনের অত্যাবশ্যকীয় প্রকৃতিই ন্যায়পরতা, অধিকার এবং সমগ্রের ভাল-এর মূল্যের সাথে জড়িত।"[২৬] কাজেই প্রকৃতিবাদী দার্শনিকরা আইনের সাথে নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করেন।

৩.৩.২ আইনগত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকঃ

কান্টের মতের বিরোধীতা করে আইনগত প্রত্যক্ষবাদীরা তাদের মত ব্যক্ত করেন। তাদের মতে, আইন আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি করে কিন্তু নৈতিক বাধ্যবাধকতা তৈরি করেনা। সুতরাং আমরা যখনই কোনো আইনের কথা বলি তার সাথে নৈতিক বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে না। বরং আইনি বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে।

আইনগত প্রত্যক্ষবাদীদের মতে, আইন হচ্ছে নির্দেশনার মত। আইন মেনে চলা মানে আইনের নির্দেশ মেনে চলা। তাই তারা বলেন যে, উচিত–অনুচিত ইত্যাদি নৈতিক বাধ্যবাধকতা না এনে বরং নিষেধ, নির্দেশ ইত্যাদি আইনগত বাধ্যবাধকতা দ্বারা আমরা আইনের ধারাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। Fact বা প্রকৃত ঘটনার আলোকেও আইনকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। ধরা যাক, আমার কাছ থেকে কেউ একজন ১০০ টাকা ধার নিয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী আমি টাকা ফেরত চাইলে সে দিতে বাধ্য। কিন্তু সে যদি টাকা ফেরত না দেয় এবং আমি যদি ১০০ টাকার জন্য মামলা করি তখন এর সাথে আইনগত বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে, নৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়।

সুতরাং আইনের বাধ্যবাধকতা থেকেই আইন প্রযোজ্য হয়। তাই প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন যে, আইনের প্রক্রিয়া আইনগতভাবেই হওয়া উচিত। তাদের মতে, আইনের যে ধারণা আছে সেগুলোকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। তাদের মধ্যে আবার কয়েকটি ভাগ রয়েছে। এদের একটি ভাগ হলো Reductionism। আইনকে যখন আমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করতে চাই তখন Reductionism এর কথা আসে। এখানে নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়। শুধুমাত্র বিষয় বা ঘটনা থাকে। বিষয় ভালো না মন্দ, উচিত না অনুচিত প্রভৃতি আসে

পরে। শুধুমাত্র ঘটনাকে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁদের মতে, আইনের বিষয় বা ঘটনাকে কেবল ব্যাখ্যা করা যায়, মূল্যায়ন করা যায়না।

আইনগত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মধ্যে John Austin এর মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপযোগবাদের সাধারণ নীতির সঙ্গে আইনের বাস্তব ধারণাকে জুড়ে দিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছেন বিশিষ্ট আইনি পন্ডিত জন অস্টিন (১৭৯০-১৮৫৯)। ইংল্যান্ডের আইন ছিল তার বিষয়, জার্মান আইনশাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতা ও বেন্থামের সুখবাদ ছিল যথাক্রমে অস্টিনের চিন্তার আইনগত ও নৈতিকভিত্তি।

অস্টিন তাঁর *Lectures on Jurisprudence*[২৭] গ্রন্থে আইনের বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি মনে করেন আইনের বিজ্ঞান শুধুমাত্র বিজ্ঞানসম্মত আইন অর্থাৎ Positive Law এর আলোচনায় সীমিত থাকবে। অস্টিন বলেন, "আইন হলো নিম্নতরের প্রতি উর্ধ্বতনের রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ মাত্র"। তাঁর মতে, সার্বভৌমের আদেশেই আইন এবং সার্বভৌম যা অনুমোদন করেন তাও আইন বলে ধরতে হবে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্যনীয় ১. সার্বভৌম (Sovereign) এবং ২. আদেশ (Command)।

অস্টিনের মতে, বেশির ভাগ মানুষ যখন অভ্যাসবশত কোনো নীতিকে মেনে চলবে তখন ঐ নীতিকে বলা হবে আইন। আর যিনি আইন প্রণয়ন করবেন তার আইন প্রণয়নে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকতে হবে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সমাজে বসবাসরত সকল ব্যক্তিবর্গের আচরণের দ্বারা যে ঘটনাবলীর জন্ম হয় তার প্রেক্ষিতে আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করবেন। আর বেশির ভাগ মানুষ যখন ঐ নীতিকে মেনে চলবে তখন তা আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।[২৮]

অস্টিন আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, আইন হলো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছার প্রকাশ। একটি নির্দিষ্ট পথ বা আচরণের অনুসরণ করেই এই ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে এবং এর থেকে কোনো রকম বিচ্যুতি ঘটলেই বিপদ। স্বাভাবিক আইনকে তিনি সংশয়পূর্ণ ও মিথ্যা ধারণা বলেই মনে করেন। দৈবিক অথবা মানবিক, আইন এই দুইয়ের যে কোনোটির ইচ্ছারই প্রকাশ। মানবিক আইন দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত- ১. সেই আইন যা কোনো রাজনৈতিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স্বাধীন সমাজে প্রয়োগ করেন এবং ২. সেই সব আইন যা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করে না। অর্থাৎ সে আইন যা এক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ অপর

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করেনা। যেমন, পারিবারিক আইন- সন্তান বা পরিবারের সদস্যদের ওপর আরোপিত অভিভাবকের আইন। এই দ্বিতীয় শ্রেনীর আইনের মধ্যে পড়ে সেসব আইন যা কোনো নির্দিষ্ট বা স্থির কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার প্রকাশ নয়। এসব আইনের মধ্যে প্রথা, রীতিনীতি, ফ্যাসান, সম্মান, বোঝাপড়া সবকিছুই পড়তে পারে। এগুলোকে অস্টিন এক কথায় বলেছেন- 'Positive Morality'. বিজ্ঞানসম্মত আইন হলো নির্দিষ্ট, তার উৎসও নির্দিষ্ট। আইনের বিজ্ঞানের এলাকা এই বৈজ্ঞানিক আইনকে নিয়েই। অস্টিনের এই আইনের বিজ্ঞানে সাংবিধানিক আইন পড়েনা। এমনকি আইনের মর্যাদাও পায় না। অস্টিনের দৃষ্টিতে সাংবিধানিক আইন, প্রথার মতো নৈতিক জগতের ব্যাপার। বিচারক প্রণীত আইন বা কিছু পন্ডিত ব্যক্তির বোঝাপড়া বা চুক্তির মধ্য দিয়ে যা গড়ে ওঠে অস্টিন-এর মতে, তা ব্যক্তিগত মতামত, আইন নয়। অস্টিনের আইনি চিন্তা যে আইনের প্রাচীন বা প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদের সন্তুষ্ট করবেনা তা বলা বাহুল্য। কারণ, সমাজের সম্মতি নিয়ে, আনুগত্য নিয়ে যে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গড়ে ওঠে সে কর্তৃপক্ষ ছাড়া আইন গড়ার বা প্রয়োগ করার অধিকার কারো নেই। সোজা কথায়, সার্বভৌমই আইনের উৎস। সার্বভৌম (আইনের উৎস) এবং রাষ্ট্র (স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজ) কথা দুটির অর্থ তিনি একটি বাক্যে প্রকাশ করেন, "যদি কোনো সমাজে কোনো নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন (ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ) অন্য কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষের বশ্যতা বা আনুগত্য স্বীকার না করে, অথচ সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে তবে ওই নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন (ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ) হলেন সেই সমাজের সার্বভৌম এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়ে গড়ে উঠা এই সমাজ হলো রাজনৈতিক ও স্বাধীন।"[২৯]

অস্টিনের মতে সার্বভৌমের অস্তিত্ব এবং তার প্রতি সমাজের অধিকাংশ মানুষের আনুগত্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সার্বভৌমের ইচ্ছাপ্রসূত এ আইনই হবে আইনসভা ও আদালতের বিষয়বস্তু। সার্বভৌম তিনিই যাকে সকলে বা অধিকাংশ মানে অথচ তিনি নিজে কারো অধীনে নন। এই ক্ষমতা অসীম, চুড়ান্ত ও অবিভাজ্য। অস্টিনের মতানুযায়ী সার্বভৌম অসীম, কারণ আইন তাকে সীমিত করতে পারেনা; চুড়ান্ত কারণের ওপর আর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই; অবিভাজ্য, কারণ এই ক্ষমতা কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না বা কাউকে অর্পণ করাও চলে না।

তাঁর মতে, সার্বভৌম শেষ ক্ষমতা, সুতরাং এর ওপর কোনো শক্তি বা প্রভাবকে আরোপ করার অর্থই হলো ধারণাটিকেই অর্থহীন করে তোলা। সম্পূর্ণ আইনের দৃষ্টি নিয়েই সার্বভৌমের অবস্থান তিনি কল্পনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমই আইনের স্রষ্টা, অভিবাবক, অন্য কেউ নয়। নীতি, প্রথা এগুলোর মূল্য অবশ্যই আছে, সাংবিধানিক বা আন্তর্জাতিক আইনও মূল্যবান। কিন্তু এগুলো

আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। সমাজ জীবনে সার্বভৌম কথাটি প্রযোজ্য নয়; শুধু আইনের জগতেই প্রযোজ্য। শুধু Positive law অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত (বাস্তব) আইনের স্রষ্টা হিসেবে সার্বভৌম অসীম, সর্বোচ্চ ও অভিন্ন। অস্টিন মনে করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ও প্রদর্শনের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং এর ফলে সার্বভৌমের প্রকৃতি বা অবস্থান ভিন্ন হতে পারে। কোথাও আনুগত্য স্পষ্ট আবার কোথাও তেমন স্পষ্ট নয় এবং সার্বভৌমের অবস্থান বিচারে এটা অবশ্যই বিবেচ্য। অস্টিনের দৃষ্টিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার বা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সার্বভৌমের ওপর কোনো বাধা নেই। তবে আইনের বাইরে বা সামাজিক কোনো বাধা থাকতেই পারে।

বেন্থামের মতে অস্টিন বলেন, জনগনের সুখ, বেশি লোকের বেশি বেশি সুখ বিধানের প্রশ্নটিও সার্বভৌমের ওপর, আইনের ওপর সীমা হিসেবে কাজ করে। বেন্থামের সুখবাদ অস্টিনের আইনগত প্রত্যক্ষবাদের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতার প্রশ্নে অস্টিন অবশ্য আবেগকে প্রশ্রয় দেন না, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়। তাঁর মতে, স্বাধীনতা অথবা নিয়ন্ত্রণ জনগণের সুখের পক্ষে যেটা হিতকর সেটাই কাম্য।

অস্টিন আইনকে 'সার্বভৌম শক্তির আদেশ' বলে বর্ণনা করে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকালয় প্রভৃতির গুরুত্বকে অস্বীকার করেছেন বলে সমালোচকদের অভিযোগ। সার্বভৌম শক্তির আদেশ না হলেও এগুলো সমাজ জীবনের ওপর আইনের মতোই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন যে, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তুরস্কের সুলতানের পক্ষেও প্রথাগত বিধিনিষেধ গুলোকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। হেনরী মেইন-[৩০]এর মতে, প্রাচ্যের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে প্রথাগত বিধিনিষেধের ক্ষমতা ছিলো অত্যন্ত প্রবল।

অস্টিন এ অভিমত ব্যাক্ত করে যে, লোকে শাস্তির ভয়ে আইন মান্য করে। কিন্তু সমাজতাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ বক্তব্য মেনে নেয়া যায় না। দ্যুগইর মতে, সামাজিক সংহতির জন্য প্রয়োজন বলেই লোকে আইন মান্য করে, রাষ্ট্রের দ্বারা প্রণীত হয়েছে বলে নয়।

লর্ড ব্রাইস আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের পাঁচটি প্রধান কারণ রয়েছে বলে মনে করেন। এগুলো হলো- ১. নির্লিপ্ততা ২. শ্রদ্ধা, ৩. সহানুভূতি ৪. শাস্তির ভয় ও ৫. আইনের যোক্তিকতার

উপলব্ধি। সুতরাং বলা যায় অস্টিন আইন মেনে চলার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণকেই একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করে ভুল করেছেন।

'আইন হলো সার্বভৌমের আদেশ'-এ কথা বলে অস্টিন আইনের 'আদেশ তত্ত্ব' প্রচার করেছেন। 'আদেশ' বলতে কোনো কিছু করা বা না করাকে বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করে আইনকে কর্তব্য নির্দেশক বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু সব আইন কর্তব্য নির্দেশক নয়। উদাহরণ হিসেবে উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ আইন প্রভৃতির মতো দেওয়ানি আইনের কথা বলা যেতে পারে।

৩.৪ আইনের সাথে স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্কঃ

সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সমাজজীবনের সুখ-সমৃদ্ধির স্বার্থে কতগুলো অধিকার অপরিহার্য। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারের ভিত্তিতেই স্বাধীনতার সৃষ্টি হয়। আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করে। সুতরাং, আইনের ওপর স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও আইনের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা। তাই বলা হয় "আইন হলো স্বাধীনতার শর্ত" (Law is the condition of liberty)। অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিহত ইচ্ছা যদি স্বাধীনতা হিসেবে স্বীকৃত হয় তাহলে দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। কারণ মুষ্টিমেয় ধূর্ত ও শক্তিশালী ব্যক্তি অপর সকলের স্বাধীনতা হরণ করে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। আইনের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে স্বাধীনতা সেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। আইন মানুষের আচার-আচরণের সীমা নির্ধারণ করে। তাই স্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে। এই অর্থে আইন স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ।

স্বাধীনতার তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ অধিকার দাবি করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। স্বাধীনতা ব্যক্তি, সমাজ, বা রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রে বিস্তৃত। সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি মানব আচরণের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতার সথে সহবস্থানে থাকা উচিত। এভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্ব-শাসন বা আত্ন-নিয়ম প্রয়োজন।

স্বাধীনতার দাবি মানবাধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং তা প্রকাশিত হতে পারে, বিশেষ করে কথা বলার স্বাধীনতা , ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব কারণে স্বাধীনতা উচ্চমাত্রায় কাম্য ও আকাঙ্খিত এবং আইনি প্রক্রিয়ায় নিছক 'মুক্তির অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণে, Russell বলেন- "প্রাপ্তির উপলব্ধির জন্য বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতির অর্থই স্বাধীনতা।"[৩১] স্বাধীনতার অধিকার বলতে যে কোনো বা সকল স্বাধীনতাকে অথবা সীমাহীন স্বাধীনতা বোঝায় না। আইনি বিধি অনুযায়ী আইন কখনো স্বাধীনতাকে আইনি সীমাবদ্ধতার বাইরে বিধিসম্মত বলে গ্রহণ করে না। যেমন, অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করার অধিকার স্বীকার করেনা।

এখানে উল্লেখ্য স্বাধীনতা (Freedom) ও মুক্তি (Liberty) সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা অধিকাংশ অভিধানে শব্দ দুটিকে একই অর্থে সঙ্গায়িত করা হয়েছে। *Oxford Advanced Dictionary*.(P.471.,1999)তে স্বাধীনতা কে ব্যক্তিগত মুক্তি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[৩০] Hannah Arendt[৩৩] এ দুটি শব্দের মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য দেখান। তিনি মুক্তি কে

সাধারণত নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি এবং স্বাধীনতাকে কোনো নির্দিষ্ট কাজে ভূমিকা রাখার সুযোগ লাভ করা (যেমন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ) অর্থে গ্রহণ করেন। আবার Isaiah Berlin তাঁর *Two Concepts of Liberty* গ্রন্থে মুক্তি(liberty) কে সদর্থক ও নঞর্থক অর্থে দেখান।[৩৪] মুক্তি কে নঞর্থক অর্থে এবং স্বাধীনতা কে তিনি মুক্তির সদর্থক ধারণা রূপে দেখেন। অভিধান এবং Berlin অনুসরণে মুক্তি এবং স্বাধীনতা কে সমার্থক অর্থে বিবেচনা করে আলোচনা করা যেতে পারে।[৩৫]

স্বাধীনতার অধিকারকে সীমাহীন যুক্তির নির্দেশনার অর্থে গ্রহণ না করে বরং একে সীমিত কাজের পরিসরের অর্থেই গ্রহণ করা যেতে পারে। লক স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি হিসেবে বিচার না করে বরং সদর্থক অর্থে গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনতাকে আইনের ধারণার সাথে সঙ্গতিবিধান করেন। তাঁর মতে, "সমগ্র হিসেবে বিশ্বের মধ্যে প্রজ্ঞা যেমন আমাকে স্বাধীন করে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আইন আমাদের স্বাধীন করে।"[৩৬]

এ দিক থেকে স্বাধীনতার সাথে আইন অনুযায়ী কাজ করার বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পর্কিত। স্বাধীনতার সীমা নিয়ন্ত্রণকারী আইন এর প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই ব্যক্তি একে অন্যকে হত্যা, নির্যাতন এবং ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে পারে। এরূপ আইনকে ব্যক্তির অধিকার খর্বকারী না বলে বরং অধিকার সমুন্নত রাখার সহায়ক হিসেবে গণ্য করা যায়।

Hillel Steiner[৩৭] এর সাথে তাঁর মত যুক্ত করেন এবং বলেন, ব্যক্তির ভুল করার অধিকার নেই, বস্তুত কঠোরভাবে বলা যায়, তাদের কোনো কিছু করার অধিকার নেই। অন্য অর্থে, প্রতিটি অধিকার কঠোর অর্থে অন্যের আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকার অর্থ এভাবে কাজ করা নয় বরং অন্যের দ্বারা ভুল উপায়ে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করা। এখানে 'উপায়' বলতে বোঝায়, অধিকারের গুরুত্ব নির্ভর করে অন্যদের ভুল আচরণের ফলাফলের ওপর এবং এভাবে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে মানুষ সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। জোর বা দমন নীতির শাসনের মতো নিয়ন্ত্রণের আদর্শ ও তত্ত্বগুলো ভুল, যাকে নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া দ্বারা বিরোধিতা করা যেতে পারে। প্রক্রিয়াগুলো, "the Commonest examples of which are education, persuasion and moral discourse."[৩৮]

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে সীমিত জীবনের পরিসরে কিছু করা বা পছন্দ করার স্বতন্ত্র অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর অর্থ ব্যক্তি এক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, পছন্দের নগণ্য স্বাধীনতা থেকে বড় ধরণের কোনোস্বাধীনতা যেমন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, নিজ ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিকতার একটি ক্ষেত্র দরকার যেখানে তারা তাদের পরিকল্পনা এবং প্রকল্প স্বাধীনভাবে চর্চা করতে পারে। নৈতিক ক্ষেত্রের ধারণা এজন্য প্রয়োজন যাতে জীবনের একটি নির্দিষ্ট পরিসর রয়েছে যা পুরোপুরিভাবে তাদের এবং অন্য কারো স্পর্ধা চলে না। ব্যক্তির স্বাধীনতা হচ্ছে আত্ন-মর্যাদাবোধ যা পুরোপুরিভাবে তার নিজের ভালোর সাথে সংযুক্ত।

৩.৪.১ জন স্টুয়ার্ট মিল এর স্বাধীনতা তত্ত্ব

উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার এক ধ্রুপদী উদাহরণ হলো স্বাধীনতা সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা। এ. ডি. লিন্ডসে বলেন, "এটা তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ লেখা এবং তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ও বৈশিষ্ট্যগত নীতি ধারণ করে।"[৩৯] আর্নেস্ট বার্কার বলেন, *On Liberty* গ্রন্থে মিল স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে গভীর ও অধিক আত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।"[৪০]

স্বাধীনতার ধারণাটিকে মিল নৈতিকতা ও সুখের সর্বোত্তম প্রকাশ হিসেবেই দেখেছেন। স্বাধীনতা আবশ্যক নিজের সুখের জন্য, স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তির মানবিক বৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হবেনা। মিলের কথায়, স্বাধীনতা হলো পছন্দের অধিকার। এ অধিকার হারালে ব্যক্তি তার অনুভূতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি, বিচিত্র ভাবনা, মানসিক তৎপরতা, নৈতিক পছন্দ কোনোকিছুর বিকাশই ঘটাতে পারবে না। মিলের মতে, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার কেন্দ্রীয় বিষয়। চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে মিল বোঝান ব্যক্তিগত চিন্তা করার এবং এই চিন্তাকে জনসমক্ষে মৌলিক বা লিখিতভাবে প্রকাশ করার স্বাধীনতা।

মিল গুরুত্ব দেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত রুচি ও পেশা বা পছন্দের স্বাধীনতাকে। তিনি বলেন, ব্যক্তি যদি অপরের ক্ষতি না করে, অপরকে আঘাত না দিয়ে নিজের স্বাধীন বৃত্তি বা পছন্দকে বেছে নেয় এবং নিজেকে বিকশিত করতে চায় তবে সে অধিকার তার থাকা উচিত।[৪১] স্বাধীনতা বলতে মিল শুধু বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও সুখী জীবন যাপনের পরিবেশকে বোঝেননি। তাঁর কাছে স্বাধীনতা হলো মানুষের আত্মশক্তির, নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনার, তার বিচিত্র দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে স্তব্ধ করবার অধিকার সমাজ বা সরকারের নেই। মিল বলেন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক।

মানবিক বৃত্তির প্রতিটি দিক আর্থাৎ উপলব্ধি, বিচারবুদ্ধি, চিন্তার বৈচিত্র্য, মানসিক তৎপরতা, নৈতিক পছন্দ সবকিছুই ব্যক্তির এই স্বাধীনতার ওপর নির্ভলশীল। মিল মানুষের কাজকে আত্ন-সম্বন্ধীয় (self- regarding) এবং অপর সম্বন্ধীয় (other-regarding) এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির আত্মকেদ্রিক কাজে (self-regarding action) রাষ্ট্র কেনোরকম হস্তক্ষেপ না করলে ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব।

স্বাধীনতা সম্পর্কে মিলের এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ স্বাধীনতা ভোগকে সকলের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তির কাজকর্মের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। বার্কারের মতে, "প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন হওয়া উচিত,..... কোনো ব্যক্তিই অবাধভাবে স্বাধীন হতে পারে না।[৪২] স্বাধীনতা সম্পর্কে মিলের ধারণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মিল এক শূন্য স্বাধীনতা ও বিমূর্ত ব্যক্তির প্রবক্তা...অধিকার সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দর্শন না থাকাতে মিলের স্বাধীনতার ধারণা সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে না।"[৪৩]

অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকার ফলে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির বিরোধী অবস্থান থেকেই যায়, ফলে ব্যক্তির ধারণা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। বার্কার স্বাধীনতা বলতে বুঝেছেন ব্যক্তির সেই ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য শর্তাবলী যা অধিকার ভোগে ব্যক্তিকে সাহায্য করে। তাঁর মতে, স্বাধীনতা দায়িত্বের সূচক, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতার পদ্ধতিগত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এবং তার অধীন। স্বাধীনতার সঙ্গে আইন, সমতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিষয়গুলোকেও মিল উপেক্ষা করেছেন।

৩.৪.২ আইন ও স্বাধীনতাঃ

আইন ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পকর্কে কেন্দ্র করে প্রধানত দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হার্বার্ট স্পেন্সার, জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক আইন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতাকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করেন। ডেভিড রিকার্ডো, আলফ্রেড মার্শাল, অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এবং গডউইন, ক্রোপোটকিন, বাকুনিন প্রমুখ নৈরাজ্যবাদী একই মতের অনুসারী। তাঁদের মতে, আইন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব উভয়ই ব্যক্তি স্বাধীনতা ধ্বংস করে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা একথা ঘোষণা করেন যে, ব্যক্তিগত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকার রাষ্ট্রের নেই। রাষ্ট্রের হাতে এ অধিকার প্রদান করার অর্থই হলো ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা। আবার, নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে অপ্রয়োজনীয় এবং অনাকাঙ্খিত বলে মনে করেন। তারা সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তথা রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের পক্ষপাতি। এমনকি লর্ড ব্রাইসের

মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার মতে, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে একটি প্রাবল্য দেখা দিলে অপরটি সংকুচিত হয়ে পড়বে। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ও নৈরাজ্যবাদীরা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার ধারণাটিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তারা ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার পক্ষপাতি।

অপরদিকে আর্নেস্ট বার্কার, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, রীচি প্রমুখ আইন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন।[৪৪] তাঁরা ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা বলতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করাকে বোঝায়, যেখানে প্রতিটি মানুষ তা নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনে সক্ষম। স্বাধীনতার উপযোগী এই পরিবেশ তখনই সৃষ্ট ও রক্ষিত হতে পারে, যখন রাষ্ট্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি দেয় এবং সেগুলোকে সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৪৫] এদিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, স্বাধীনতা একদিকে যেমন আইনের ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে তেমনি আবার রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তাই প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে আইনের দ্বারা অনুমোদিত স্বাধীনতাকেই বোঝায়। আইন ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হবহাউস্[৪৬] বলেছেন যে, "আইন না থাকলে স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়বে। ফলে, অন্যরা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে। আইন হলো মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রনকারী সার্বভৌম শক্তির দ্বারা সমর্থিত নিয়মাবলী"। তাই আইনানুমোদিত স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত বা অবাধ হতে পারেনা। এজন্য ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন যে, স্বাধীনতার প্রকৃতির মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান।[৪৭] আপাতদৃষ্টিতে আইন ও স্বাধীনতাকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করে বার্কার এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে, আইন ও স্বাধীনতা কখনই পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়না; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।[৪৮] এই অর্থে প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিকভাবে সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।

বিভিন্ন আইনের দ্বারা স্বাধীনতার সৃষ্টি ও প্রসার ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রমিক-কল্যাণ আইনের কথা বলা যায়। এ আইনের দ্বারা মালিক শ্রেণির স্বেচ্ছাচারিতা সঙ্কুচিত হয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা সম্প্রসারিত হয়েছে। দার্শনিক রীচির মতে, 'স্বাধীনতাকে যদি আত্মবিকাশের জন্য আবশ্যক

সুযোগ-সুবিধা বলে গণ্য করা হয়, তবে তা অবশ্যই আইনের দ্বারা সৃষ্টি'।[৪৯] তাছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের প্রতিনিধিপুষ্ট আইনসভার দ্বারা জনমত অনুসারে আইন প্রণীত হয়। সুতরাং আইন ও জনগণের স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ থাকতে পারেনা।

আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র প্রধানত তিনটি উপায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। প্রথমত, সবলের অত্যাচারের হাত থেকে আইন দুর্বলকে রক্ষা করে। আইন থাকলে কোনো ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতার ফলে যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট হতে না পারে, সেজন্য রাষ্ট্র বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়ন করতে পারে। তৃতীয়ত, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র এমন একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণ, অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে জনহিতকর আইন প্রণয়ন করছে।

বার্কারের মতে, স্বাধীনতা হলো আপেক্ষিক। অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে থেকে প্রত্যেকে যাতে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, সেজন্য আইন সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তাই বার্কার স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার কথাই বলেছেন এবং এই ধরনের স্বাধীনতা কেবল আইন-নির্দিষ্ট পথেই ভোগ করা সম্ভব।

কিন্তু আইন সর্বক্ষেত্রেই যে স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে কাজ করবে এমন কোনো কথা নেই। অধ্যাপক ল্যাস্কি এবং কার্ল মার্কস ও তার অনুসারীরা মনে করেন, ধন-বৈষম্যমূলক সমাজে আইন বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন সর্বদাই ধনিক-বনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ট দরিদ্র জনসাধারণ কখনই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। কারণ, এরূপ রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানা সংখ্যালঘু পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় রাষ্ট্রীয় আইন তথা রাষ্ট্র এই শ্রেণির স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার ফলে তাদের সাামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আবার, কোনো কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আইন স্বাধীনতার রক্ষক না হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেসমূহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । এই ধরনের রাষ্ট্রে আইন শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার

পরিবর্তে তার ওপর নানা ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। ফলে এরূপ রাষ্ট্রে আইন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কখনোই স্বাধীনতার শর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজে আইন স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ, এখানে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কোনোরূপ বিরোধ দেখা দেয় না। সুতরাং বলা যায়, আইন ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। প্রকৃতিগতভাবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যত বেশি, গণতান্ত্রিক হবে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ততই ঘনিষ্ট হয়ে উঠবে।

৩.৪.৩ অধিকার প্রতিষ্ঠায় 'সমতা'র ধারণা

সাধারণ অর্থে সমতা বলতে বোঝায় সকল মানুষ সমান। তাই প্রত্যেকে সমান সুযোগ-সুবিধা, সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় সমতা বলতে সমস্ত বিষয়ে সমতা বা অভিন্নতা বোঝায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হলো সকলের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার সমতা। এই অর্থে সাম্য প্রত্যেকের আত্মোপলব্ধিতে সহায়ক হয়। রাষ্ট্র কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেক নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিবে, যাতে সকলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমান সুযোগ পায়।

সমতা ধারণাটির একটি সুসংগঠিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক আর্নেষ্ট বার্কার। তিনি সমতাকে স্বাধীনতার মতো অধিকার বণ্টনের একটি পদ্ধতিগত নিয়মাবলী হিসাবে দেখেছেন এবং বলেছেন এটি ন্যায়ের অনুসরণে গঠিত, ন্যায় থেকে উদ্ভূত এক নিয়ম। তিনি সমতাকে স্বাধীনতার মতো অধিকার বণ্টনের একটি পদ্ধতিগত নিয়মাবলী হিসাবে দেখেছেন এবং বলেছেন এটি ন্যায়ের অনুসরণে গঠিত, ন্যায় থেকে উদ্ভূত এক নিয়ম। বার্কারের মতে, সাম্য হলো অধিকার হিসেবে আনার জন্য কিছু শর্ত নিশ্চিত করা, যা অন্যের জন্যও একইভাবে নিশ্চিত হয়।[৫০] সাম্য বলতে তিনি আইনগত সাম্য ও সামাজিক সাম্য উভয়কে বুঝেছেন। আইনগত দৃষ্টিতে সমতা আইনগত সাম্য। রাষ্ট্রে বসবাসকারী আইনগত সমতা অর্থাৎ বৈধ সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিক এই সমতা ভোগ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আইনগত সাম্যই পর্যাপ্ত নয়, সামাজিক সাম্যও প্রয়োজনীয়। বার্কার মনে করেন, অবাধ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দ্বারা মানুষের সামর্থ্যকে সমান করা বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মানুষের আর্থিক সঙ্গতি বিধানের মধ্যই রয়েছে সামাজিক সাম্য। তাঁর মতে, সকলেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমান

ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারবে না যতক্ষণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যয়ভার বহনে অসাম্য থাকছে। সামাজিক সাম্য প্রসঙ্গে বার্কার মূলত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন।

বার্কার মনে করেন, আইনগত সাম্যকে বাস্তবায়িত করতে গেলে আর্থিক সমতা একান্তই দরকার। নাগরিকতার ধারণাকে সমকক্ষ নাগরিকতার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আর্থিক সমতাকে আইনগত সমতায় আপেক্ষিক করে তুলতে হবে। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্পতি অর্জন ও ভোগের বিভিন্নতা ও সাম্যকে তেমন বড় করে দেখেন না। তাঁর মতে, যে পরিমাণ বিষয় সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে ভোগ করা হচ্ছে তা যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোনোভাবে অর্জিত হয় তবে তার জন্য সৃষ্ট অসাম্যকে সংশোধনের প্রয়োজন আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, সৌভাগ্যমূলক অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তিনি সংশোধন চেয়েছেন। নৈতিকতার স্বার্থে এই সংশোধন অপরিহার্য।

সাম্যের প্রকৃতি এবং সাম্য ও অধিকারের সম্পর্ক বিষয়ে বার্কারের বিশ্লেষণ কৌতুহলজনক বটে, কিন্তু ল্যাস্কির ব্যাখ্যা বেশি চিত্তাকর্ষক। অধ্যাপক ল্যাস্কি স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ধারণা হিসেবেই সাম্যের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতা তার উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে যে মাধ্যমেই সাহায্য নেয় সেটি হলো সাম্য। সমতার মধ্যে দিয়েই স্বাধীনতার বাস্তবায়ন সম্ভব।

ল্যাস্কি মনে করেন না সাম্য বলতে Identity of treatment বোঝায় (অর্থ্যৎ একইভাবে সকল মানুষের প্রতি একই আচরণ)। যেখানে মানুষ তার চাহিদা ও সামর্থে পৃথক সেখানে সকল মানুষের প্রতি সম আচরণ সম্ভব নয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি নেতিবাচক ও ইতিবাচক এই দুদিক থেকে সাম্যকে দেখান। তাঁর মতে, সাম্য বলতে বোঝায় (১) বিশেষ সুযোগ- সুবিধার অনুপস্থিতি ও (২) সকলকে পর্যাপ্ত সুযোগ- সুবিধা প্রদান। প্রথমটি হলো সাম্যের নেতিবাচক দিক এবং দ্বিতীয়টি হলো ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক অর্থে সাম্য বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্পতি, লিঙ্গ প্রভৃতির ভিত্তিতে কোনো রকম বৈষম্য না করাকে বোঝায়। কারণ, এগুলোর ভিত্তিতে বৈষম্য করার অর্থই হলো ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ইতিবাচক অর্থে সাম্য বলতে 'পর্যাপ্ত সুযোগ- সুবিধা' প্রদানকে বোঝায়। 'পর্যপ্ত সুযোগ-সুবিধা' এবং 'সমান সুযোগ-সুবিধা' অভিন্ন ধারণা নয়। যেহেতু সব মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও দাবী সমান নয় এবং তাদের প্রচেষ্ঠাও একই ধরনের হয় না, সেহেতু তাদের আত্নবিকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। তিনি সমতা বলতে এটাও বোঝান না যে সবার শ্রমের পুরষ্কারই সমান।

সমতা তখনই হবে সমতা সাধনের প্রক্রিয়া যখন কোনো মানুষ সমাজে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না যাতে সে অপরের নাগরিকতায় আঘাত করে। সমতা হলো আমি যেমন আমার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাব, অপরেও তেমনি পাবে।[৫১] সমতা হলো সামাজিক শক্তির এমন বিন্যাস যা পরিশ্রমের অংশভাগের সাথে প্রাপ্যের অংশভাগে একটি ভারসাম্য আনে। সমতা হলো সব মতামতকেই সমান মূল্য দেওয়া।

সমতা প্রশ্নে ল্যাস্কি শুধু রাজনৈতিক সমতাকেই বোঝান নি। তাঁর মতে অর্থনৈতিক সমতা ছাড়া রাজনৈতিক সমতার কোনো মূল্য নেই। অর্থনৈতিক অসাম্য থাকলে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর্থিক ক্ষমতার ক্রীড়নক হয়ে পড়বে। *Grammar of Polities* এ সমতার প্রশ্নে মাকর্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি ল্যাস্কিকে প্রভাবিত করেছে। পুঁজিবাদী সমাজে অসাম্য যে এক স্বাভাবিক প্রবণতা এবং শিল্প পুঁজিবাদ যে এই অসাম্য সৃষ্টির মূলে সে কথা বলতে দ্বিধা করেন নি। পুঁজিবাদী সমাজ যে অসম সমাজ এবং এখানে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা রুদ্ধ হয়, বিভেদ প্রসারিত হয় *Liberty in the Modarn State* গ্রন্থেও ল্যাস্কি এই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ছিলেন। স্বাধীনতা যে সাম্যের পরিস্থিতি ছাড়া অসম্ভব একথা তিনি *'Democracy in Crisis* গ্রন্থেও বলেছেন। তাই তিনি প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন এনে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার কথা বলেছেন, যেখানে আর্থিক ও রাজনৈতিক পীড়ন থাকবে না, ব্যক্তির মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে, মানবিক গুণের বিকাশ ঘটবে এবং রাষ্ট্র হবে দায়িত্বশীল।

তথ্য নির্দেশ

১. ক্ল্যাসিক্যাল যুগ, মধ্যযুগ ও রেঁনেসার যুগের বিভিন্ন দার্শনিক যেমন রোমান সিসেরো, ফ্রান্সের Bodin ও Jean Jacqus Rousseau, ইতালীর Hugo Grotius, ইংল্যান্ডের Sattel, John Locke ও Blackston, জার্মানীর Karl Marx প্রমুখ রাষ্ট্র দার্শনিক এ মত ব্যক্ত করেন।

২. হবস, বোঁদা, অস্টিন, হল্যান্ড ও গ্রোসিয়াস প্রমুখ রাষ্ট্র দার্শনিক এ দলের অন্তর্ভুক্ত।

৩. N.E Simmonds, *Philosophy of Law*, (Harcourt Brace College Publishers, New York 1996), p.388.

৪. Johari, J. C., *Contemporary Political Theory*, Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.196.

৫. Dunning, *A History of Political* Theories*. From Rousseau to Spencer* (Central Book Depot, Allahbad, 1967), p.229.

৬. অধ্যাপক হল্যান্ড আইনগত প্রত্যক্ষবাদের যৌক্তিকতা দেখান। (Laski: *A Garmman of Politics* (London: Gorge Allen and Union) 1951, p. 50)

৭. Henry Maine তাঁর Ancient Lane গ্রন্থে দেখান কিভাবে প্রাচীন রোমন অনুশীলন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আইনের উৎপত্তি ও বিকশিত হয়। একই উদ্দেশ্য F.W Maitland তাঁর *Outlines of English Legal History* গ্রন্থে মধ্যযুগীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করে এমত সমর্থন করেন। James Bryee তাঁর *Study in History and Jurisprudnce* (Oxford,1951). vol.II, P.249 গ্রন্থে এবং Sir Fredrick Pollock তাঁর *First Book of Jurisprudunce*, P.24 এ দেখান রাষ্ট্রের পূর্বেই আইনের অস্তিত্ব ছিল। Johari, J. C., *Contemporary Political Theory*, Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.206.

৮. Johari, J. C., *Contemporary Political Theory*, Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.207.

৯. V.G. Afanasyev: *Marxist Philosophy* (Moscow: Progress Publishers), 1978), p.71

১০. A.Y. Vyshinsky: *The law of the Soviet State* (New York: Macmillan,1948), p.37.

১১. Johari, J. C., *Contemporary Political Theory*, Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.209.

১২. *Ibid*, p.198.

১৩. G. H. Sabine, *History of Political Theory* (Oxford and IBH Publishing Co.1968) p.104.

১৪. *Ibid*, p.207.

১৫. R.G. Gettell, *History of Polical Thought* (George Allen and Unwin Ltd., London, 1932), p.189.

১৬. Grotius, in Dunning, p.152.

১৭. *Ibid*., p. 154.

১৮. Locke, *Two Treatises*, in Bluhm, W.T., *Theories of the Political System* (Prentice Hall of India 1981), p.305.

১৯. G.H. Sabine; *A History of Political Theory* (New York: Harper), 1948, p.163.

২০. W.T. Jones, *Masters of Political Thought*, (George Harrap and Co. Ltd., London, 1969), p.298.

২১. Hegel, *Philosophy of Right* in H. Hallowell, *Main Currents in Modern Political Thought*, (New York; Holt, Rinchart and Winston),1960. p.263.

২২. Hegel in, C.L., *Wayper Political Thought* (B.I. Publication, 1983) p.163.

২৩. Kant, *Critique of practical Reason* in Will Durant: *The Story of Philosophy* (The Pocket Library, U.S.A) 1954, p.277.

২৪. I. Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*, (Trans.) T. K. Abbott , London;Longmans,1962, p.27.

২৫. ইমানুয়েল কান্ট, *নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি*, অনুবাদঃ সাইয়েদ আবদুল হাই, (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২), পৃ. ৫২.

২৬. N.E. Simmonds, *Philosophy of Law*, (Harcourt Brace College Publishers, New York, 1996) p. 389.

২৭. Austin *Lectures on Jurisprud*, in Dunning, *A History of Political Theory*. p.224.

২৮. Dunning, W.A., *A History of Political Theories*. From Rousseau to Spencer (Central Book Depot, Allahabad, 1967) p. 225.

২৯. Austin, *Lectures on Jurisprudence in Dunning*, *A History of Political Theories,* p.227.

৩০.Henry Maine, *Ancient Law*; in Gettell; *History of Politcal Thought*.P.334

৩১. B. Russell, Sceptical Essays, in N. Haque, *Applied Philosophy*, (Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2015) p.20.

৩২. Haque, N., *Applied Philosophy*, A New Horizon of Thought, (Dhaka: Jatiya Sahitya Prakash), 2015. p.20.

৩৩. See, Birch, A.H. *The Concepts and Theories of Modern Democracy* (London and New York: Routledge, 1996). p.95.

৩৪. *Ibid*. p.95.

৩৫. B. Russell, Sceptical Essays, in N. Haque, *Applied Philosophy*, (Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2015) p.21.

৩৬. J. Locke, *Two Treatises of Civil Government,* Peter Laslett(ed), (London: Cambridge University Press,1960), p.125.

৩৭. H. Steiner, *An Essay of Rights*, (Oxford: Blackwell Publisher, 1994), P.8.

৩৮. *Ibid*., p.8.

৩৯. John Stuart Mill: *On Utilitarianisn, Liberty, Representative Government* (Introduction by A.D. Lindsay), (London: Everyman's Library, 1964), p.Vii.

৪০. E. Barker, *Political Thought in England*, 1848-1914 (Oxford University Press), p.3.

৪১. Mill, *On Liberty* (Everyman's Library, London, 1964), p.116

৪২. E. Barker, *Political Thought in England*, 1848-1914 (Oxford University Press), p.7.

৪৩. *Ibid*, p.7.

৪৪. তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ-এর বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেন এবং আইনই স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও প্রসারে সাহায্য করে বলে মনে করেন।

৪৫. H. Laski, *Political Thought in England*, From Locke to Benthan, p.30-31.

৪৬. Hobhouse, L.T., *Social Evolution & Political Theory*, (New York: The Columbia University Press, 1911), p.145.

৪৭. H.Lask: *The Rise of European liberalism* (London, Unwin Books) 1962. p.78-79.

৪৮. E. barker, *Political Thought in England*. p.41.

৪৯. D.G. Ritchi: *Natural Right*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1952) P-114.

৫০. E. Barker, *Political Thought in England*, p.151.

৫১. H.J. Laski, *A Grammer of Politics*, (George Allen and Unwin Ltd. London, 1937), p.153.

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

মানবাধিকার ব্যাখ্যায় নৈতিকতার স্বরূপ নির্ণয়

মানবাধিকারের ধারণা আইনগত অধিকারের চেয়ে নৈতিক অধিকারের সাথে বেশি সংশ্লিষ্ট বলে দাবি করা হয়। নৈতিক অধিকারের ব্যাখ্যায় নৈতিকতাকে সদর্থক অর্থে বিচার করা হয়। সদর্থক অর্থে নৈতিক অধিকার বলতে বোঝায় কোনো সমাজের সদস্য হিসেবে সে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি থেকে ব্যক্তির কী অধিকার প্রাপ্তি হলো অথবা প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে কী ধরনের অধিকার ভোগ করল ইত্যাদি। যেমন, কোনো সমাজের প্রথা অনুযায়ী ব্যক্তির নৈতিক অধিকার থাকে অপমানিত বা লাঞ্ছিত না হওয়া। মানবাধিকারের নৈতিক ভিত্তি কীরূপ তা নির্ধারণের জন্য নৈতিকতার ধারণা সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৪.১ নৈতিকতার ধারণা

নৈতিকতার বিষয়বস্তুকে যদি আমরা 'অবজেক্ট' বলে ধরে নেই, তাহলে অনায়াসে বলা যায়- বাস্তবতার সকল প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অনুভব ও উপলব্ধি হচ্ছে তার সারার্থ। ব্যবহারিক অর্থে বাস্তবতাকে আমরা বাস্তব পৃথিবী ও তৎসংলগ্ন সকল মানবীয় অভিজ্ঞতা বলে নির্দেশ করতে পারি। এ অভিজ্ঞতার সীমারেখাকে আরো দীর্ঘায়িত ও বিস্তৃত করা যেতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ফসল হিসেবে যৌক্তিক ও অনিবার্যভাবে ব্যক্তিকে এ অভিজ্ঞতার বাহক বা 'সাবজেক্ট' হিসেবে নির্দেশ করতে হয়। নৈতিক অভিজ্ঞতার বাহক হিসেবে ব্যক্তিকে নির্দেশের সময় তার জটিল অন্তর্গত প্রকৃতির কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এই জটিল প্রকৃতিতে ব্যক্তির নির্দিষ্ট মনোজৈবিক সংহতি ও তার জৈব সামাজিক সংহতির সাথে সাথে তার সামাজিক সম্পর্কে অংশীদারীত্বের কথাও বলা হচ্ছে। বাস্তবতার সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক যাই হোক না কেন- এ পারস্পরিক সম্পর্কের সার্বিক প্রকাশকেই আমরা নৈতিকতা বলে অভিহিত করে থাকি।

নৈতিকতার বা সমাজে গৃহীত সাধারণ নীতিমালা যেহেতু দীর্ঘ সময়ের সামাজিক সম্পর্কের ফসল তাই এর একটি যৌক্তিক চরিত্র আছে। নৈতিকতা সর্বদাই সামাজিকভাবে এক প্রকার যৌথ দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা দ্বারা এর চরিত্র প্রভাবিত হয় না। নৈতিকতা প্রধানত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হলেও সামাজিক দায়িত্বের প্রতি ব্যক্তির অসম্মতি জ্ঞাপনের হাতিয়ার হিসেবেও এটি কার্যকরী হতে পারে। আবার অসুন্দর ও অনৈতিক যে অর্থে সমার্থক, সুন্দর ও নৈতিক সে অর্থে

অভিন্ন। নৈতিকতার তাৎপর্য হচ্ছে যা কিছু ভাল বা সুন্দর তা গ্রহণ আর যা খারাপ বা অসুন্দর তার প্রত্যাখ্যান।

নৈতিকতা বা নৈতিক ব্যবহারের আদৌ কোনো সামাজিক চেহারা আছে কিনা, এক সময় এটাই ছিল তুমুল বিতর্কের বিষয়। কান্টের[১] মতো ভাববাদী চিন্তাবিদদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নৈতিকতার একটি সার্বভৌম ও নিজস্ব চরিত্র আছে। প্রকৃত অর্থেই নৈতিকতার এক প্রকার a prori'[২] মৌলিকতা আছে। প্রতিটি ব্যক্তি নিজেই এই মৌলিকতা নির্ণয় করে এবং ব্যক্তির নৈতিক ব্যবহারে বাইরের উপাদানের প্রভাব অনুপস্থিত। কান্ট নৈতিকতার সার্বভৌম অস্তিত্বের কথা বললেও কোনভাবেই তার আপেক্ষিকতার কথা বলেন নি। কার্ণাপ ও আয়ারের মতো নিউপজিটিভিষ্টরা মনে করেন, কোনটি নৈতিক কোনটি অনৈতিক, কোনটি সঠিক কোনটি ভ্রান্ত, এমন কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায় না। কারণ কার জন্য নৈতিক বা অনৈতিক- এখানে সে প্রশ্নটি জড়িত। এখানে স্পষ্টভাবেই সামাজিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক ব্যবহারের গুণাগুণ নির্ভর করে ফলাফলের সার্বিক মূল্যায়নের ওপর। নৈতিক ব্যবহার সর্বদাই একটি ইতিবাচক কার্যকলাপের সমার্থক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নৈতিকতা মূলত একটি সামাজিক প্রশ্ন। নৈতিকতাকে কোনো শাস্ত্রীয় অর্থে গ্রহণ না করে যদি নিয়মবদ্ধ নীতিমালার অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখা যায় এ ধারণাটির একটি আদর্শগত দিক আছে। এ আর্দশগত দিকটি মুখ্যত শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, মানবিক-অমানবিক এই জাতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচিত বিপরীত ফলবাহী প্রশ্নসমূহের সার্বিক মূল্যায়নের চেষ্টা করে। এ প্রশ্নগুলো দৃশ্যতই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলাফল হিসেবে সমাজকে আংশিক অথবা সার্বিকভাবে প্রভাবিত করে। কান্ট বলেন, "সৎ ও শুভ, প্রকৃত জ্ঞানী ও সজ্জন হবার জন্য আমাদের কি করা উচিত, তা জানার জন্য বিজ্ঞান বা দর্শনের প্রয়োজন হয় না।"[৩] নীতিবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে হিতোহিতো জ্ঞান দান করা নয়; 'সদা সত্য কথা বলিবে' জাতীয় কোনো নৈতিক অনুশাসন প্রণয়ন করাও নয়; মানুষ যাতে প্রচলিত নৈতিক অনুশাসন অনুসরণ করে চলে সে বিষয়ে সতর্ক করাও নয়। প্রকৃতপক্ষে, "নীতিবিদ্যার কাজ মানুষের আচরণের নৈতিক বিচার করা এবং প্রচলিত নীতিবিশ্বাসগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা, নৈতিক জ্ঞান বা হিতোপদেশ দান করা নয়।"[৪]

ন্যায়ের ধারণা নৈতিকতার সাথে যুক্ত। ন্যায় বা ন্যায়পরতার ধারণা একটি জটিল ধারণা, তা আইন ও নৈতিকতা উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত পদ। এ প্রসঙ্গে D. D. Raphael বলেন, "ন্যায়পরতার একটি জটিল ধারণা, এটা আইন ও সামাজিক নৈতিকতা উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।"[৫]

আইনের পরিসরে ন্যায়পরতা কথাটির ব্যাপক প্রচলন থাকলেও বর্তমানে আইনের পরিসরের চাইতে নৈতিক পদ হিসেবেই অধিকতর গুরুত্বের সাথে কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হয়।[৬] নৈতিকপদ হিসেবে ন্যায়পরতা কথাটির একটি নীতিদার্শনিক বা নৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণত নৈতিক উক্তির বিশ্বজনীন নীতির ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়। নৈতিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কান্ট বলেন, "নৈতিকতা হচেছ সর্বজনীনভাবে বৈধ ইচ্ছার স্বাধীনতা নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ক্রিয়া। এটা এমন একটি সম্পর্ক যাতে ক্রিয়াগুলো সাধারণ নীতির প্রতি অটল থাকে"[৭] ..."যেহেতু বোধশক্তি হচ্ছে নৈতিক অবধারণ ও নিয়মের এমন মৌলিক দক্ষতা, তাই বোধশক্তির নীতির প্রতি অধিনস্থ সাধারণ ক্রিয়া হলো নৈতিকতা।"[৮] কান্ট নৈতিকার শর্ত হিসেবে বিশ্বজনীনতা, আত্মসংহতি, ও নৈতিক আত্মজিজ্ঞাসার কথা বলেন। তবে কোনো উক্তি বিশ্বজনীন হলেই তা যে নৈতিক হবেই এমন কোনো আবশ্যিকতা নেই। নৈতিকতার বিষয়বস্তু হিসেবে মানব মঙ্গলের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা, বিশুদ্ধ আকারণ নৈতিকতার একমাত্র বিচার্য হতে পারে না। এ কারণে জি. জে ওয়ারনক মানব মঙ্গল ও অমঙ্গলকে নৈতিকতার বিষয় হিসেবে গ্রহণের কথা বলেন।[৯] মানব মঙ্গলকে নৈতিকতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা এ নিয়ে অবশ্য নীতিদার্শনিকদের মধ্যে বির্তক রয়েছে।[১০]

ফ্রাঙ্কেনা নৈতিক দৃষ্টিকোণ (Moral point of view) বলতে বুঝেছেন, ১. কোনো ব্যক্তির কাজ, কামনা, প্রবনতা, অভিপ্রায়, প্রেষণা অথবা কোনো ব্যক্তির চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানমূলক বিচার করা; ২. নিজ অবধারণের বিশ্বজনীন রূপদান করতে রাজী হওয়া; ৩. সচেতন সত্তার (Sentient being) জীবনের ওপর কতখানি সুখ বা দু:খ দেখা দিতে পারে-এসব বিবেচনা যদি যুক্তিতে স্থান পায়, তাহলে এবং শুধুমাত্র তখনই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থান পায়, তাহলে এবং শুধুমাত্র তখনই ব্যক্তির দৃষ্টিটভঙ্গিকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ বলা যেতে পারে।[১১] উপরিউক্ত শর্তের ভিত্তিতে মানমূলক উক্তিকে নৈতিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে, নৈতিক মূল্য বা কর্তব্য বিষয়ক মানমূলক বিচার, বিশ্বজনীনতা ও মানব মঙ্গল এই তিনটি শর্তের ভিত্তিতে বিচারকে আমরা নৈতিক বলে মনে করতে পারি।

৪.১.১ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়

ন্যায় সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় যে, এর একটি আর্দশগত দিক এবং একটি বস্তুগত দিক রয়েছে। আদর্শগত দিকটি হলো মূল্যায়নধর্মী আর বস্তুগত দিকটি বর্ণনাধর্মী যা সমাজের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত। বস্তুগত দিকটি রাষ্ট্রীয় আইন বা আইনের শাসনের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বস্তুনিষ্ঠ বা বস্তুগত দিক থেকে যদি ন্যায়কে দেখা হয় তবে এর তিনটি ধারণা পরিলক্ষিত হয়-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। এ বিষয় গুলো পরস্পর সম্পর্কিত অর্থাৎ একটির আলোচনা করতে গেলে আরেকটির আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে। তবে সব ধরনের ন্যায়ই সামাজিক ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক ন্যায়ঃ

ন্যায়ের ধারণা মূলত একটি সামাজিক বিষয়। সমাজ বিচ্ছিন্ন বা সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন অর্থহীন। কুর্ট বেয়ার এর মতে, নৈতিকতা কেবল সমাজের মধ্যেই সম্ভব। তিনি বলেন, "সমাজের বাইরে মানুষের জন্য এসব নিয়ম পালনের, অর্থাৎ নৈতিক হবার কোনো কারণ নেই। অন্য কথায়, সমাজে বাইরে ভাল ও মন্দের পার্থক্য চোখে পড়েনা।[১২] জন রলসও ন্যায়ের ধারণাকে কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করেন। রলসের মতে "... আমি ন্যায়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের একটি গুণ হিসেবে বিবেচনা করি..."[১৩] ন্যায়ের ধারণাকে রলস সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেন। চার্লস রিডের মতে, ন্যায়পরতা হলো একটি সামাজিক প্রপঞ্চ, যেখানে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক পরস্পরের সাথে কি ধরনের সম্বন্ধে জড়িত তা বিবেচনা করা হয়। তাই সমাজ ব্যতীত নৈতিকতার প্রসঙ্গটি আসে না।[১৪] W. D. Hudson এর মতে, সমাজ হলেই নৈতিকতার বিষয়টি অনিবার্যভাবে আসে না। তিনি মনে করেন, কুর্ট বেয়ার সুসামঞ্জস্যর্পূণ সমাজের জন্য নৈতিকতার প্রয়োজনের কথা বলেন।[১৫] একইভাবে ডেভিড হিউম ন্যায়কে জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, ".... জনসাধারণের উপযোগিতার দিকটিই ন্যায়ের মুখ্য বিষয়...."।[১৬] এ সকল দার্শনিকের চিন্তায় ন্যায়কে সামাজিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সামাজিক ন্যায়ের ধারণা সমাজতন্ত্রের মধ্যে অর্থাৎ কার্ল মার্কসের চিন্তায় দেখা যায়। মার্কস অবশ্য ন্যায় কথাটি ব্যবহার করেননি। সমাজকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুগত ধারণার ভিত্তিতে। তিনি

পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎকে ন্যায় বা অন্যায় কোনটিই বলেননি। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক। ফলে পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাত করবেই। তাই এ ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেন। রলস এর ন্যায় তত্ত্বে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা পাওয়া যায়। তবে উন্নত বিশ্বের সমান অধিকারের ধারণা এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণার মধ্যে এক ধরনের বিরোধ দেখা যায় বলে অনেকে মনে করেন। A.M Maclead তাঁর '*Equality of Opportunity, Some Ambiguities in the ideal*' 'প্রবন্ধে সামাজিক ন্যায়ের সমালোচনা করে বলেন সুযোগের সমতার যে ধারণা তার মধ্যে দ্ব্যর্থকতা রয়েছে। তিনি মনে করেন সুবিধা মানে হলো কোনো কিছু করার, হওয়ার বা পাওয়ার সুবিধা। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের কারণে কেউ যদি কিছু পেতে চায় বা হতে চায় তাহলে অবশ্যই অন্যের ক্ষতি হবে এবং এ ক্ষেত্রে কিছুতেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আবার F. A Hayek তার *The constitution of liberty*[১৭] গ্রন্থে বলেন, সমতা ব্যাপারটির প্রধান সমস্যা হলো মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য রয়েছে। এই প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণেই এক এক জন মানুষ এক এক ধরনের কাজ করবে এবং পৃথক পৃথক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। কাজেই প্রাকৃতিক পার্থক্যকে যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে সামাজিক ন্যায়ের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) সামাজিক ন্যায়ের ধারণা অর্থবহ হয়। কিন্তু তিনি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় (সামাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) সামাজিক ন্যায়ের ধারণা অর্থহীন বলে মনে করেন। কারণ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত নয়। কাজেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিস্বার্থে পরিচালিত যে ব্যবস্থা সেখানে সামাজিক ন্যায় অর্থহীন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, Maclead এবং Hayek এ দুইজন উদারপন্থীই সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে গ্রহণ করেননি। তারা প্রধানত সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করেছেন। সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্য হলো ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টির স্বার্থ। অর্থাৎ সামাজিক মুক্তির জন্য সমষ্টির স্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থাকবে। কাজেই রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে বা সমাজটা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হবে। নেতিবাচক উদারপন্থীরা এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ধারণার বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থা তৈরি করবে যেখানে রাষ্ট্র ব্যক্তির ওপর বল প্রয়োগ করবে। আবার সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্র দার্শনিক Robert Nozickও এ ধরনের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে,

রাষ্ট্রই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় থাকলে সেখানে ব্যক্তির স্বকীয়তা বলে কিছু থাকে না। এ কারণেই তারা সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে গ্রহণ করতে চাননি।

অর্থনৈতিক ন্যায়:

সামাজিক ন্যায়ের ধারণাই অর্থনৈতিক ন্যায়ের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত অশুভ বা খারাপ দিক রয়েছে সেগুলো দূর করাই হলো অর্থনৈতিক ন্যায়ের মূল লক্ষ্য। তবে সামাজিক ন্যায়ের অশুভ দিকগুলোই হলো অর্থনৈতিক ন্যায়ের অশুভ দিক। সুতরাং অর্থনৈতিক ন্যায় হলো সামাজিক ন্যায়ের একটি অনুসিদ্ধান্ত। অর্থনৈতিক ন্যায় বলতে শোষণ থেকে মুক্তি এবং জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টনকে বোঝায়। যেমন মার্কসের মতে, পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণির শোষণই হলো অর্থনৈতিক অশুভ দিক এবং এই ধরণের অর্থনৈতিক অশুভ দিকগুলোকে দূর করাই হলো অর্থনৈতিক ন্যায়।

আবার আজকের দিনে স্বাধীনতার ধারণাটি কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক ধারণা হিসেবেও এটি পরিচিতি লাভ করেছে। কারণ বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। অর্থাৎ আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি স্বাধীনতা না থাকে বা সম্পদ ভোগ করার স্বাধীনতা না থাকে, তবে ঐ স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। এ জন্যই বর্তমান যুগে স্বাধীনতার ব্যাপারটি কেবলমাত্র রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত নয়, অর্থনীতির সাথেও সম্পর্কিত। কাজেই অর্থনৈতিক ন্যায় মানেই হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন বা প্রতিষ্ঠা করা।

অথনৈতিক স্বাধীনতা বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে অর্থনৈতিক পার্থক্য রয়েছে তা দূর করা হলো অর্থনৈতিক ন্যয়ের মূল কথা। অর্থনৈতিক ন্যায়ের ধারণার মধ্যে সাধারণের কল্যাণ বা মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং মানুষের কল্যাণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সম্ভব নয়। এ জন্যই সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত বা পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত বা পুনর্বিন্যস্ত করার অর্থ হলো জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা যাতে মানুষে মানুষে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে আসে।

রাজনৈতিক ন্যায়ঃ

রাজনৈতিক ন্যায়ের মূল কথা হলো একটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকার। রাজনৈতিক ন্যায় বলতে বোঝায় রাজনীতির ক্ষেত্রে অবাধ ও নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ। যেমন, নির্বাচনে যে ভোটাধিকারের কথা বলা হয়-প্রত্যেক ব্যক্তির ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। অর্থ্যাৎ কেউ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবে না, আরোপ করবে না। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ব্যাপারটাই হলো ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকার। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বলা হয় রাজনৈতিক ন্যায়। অধিকারবলে জনগণের আশা-আকাংখা, চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হবে তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা। ফলে এখানে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে জনগণের মত অনুযায়ী অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি এখানে রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাবে। ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার হলো রাজনৈতিক ন্যায়ের মূল কথা। এখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ করা। ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষিত হলেই রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

ব্যক্তির অধিকার বা ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নটি থাকে বলে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির একটা দায়িত্ব থাকে। এখানে রাষ্ট্রের যেকোনো বিষয়ে ব্যক্তির অসন্তোষ প্রকাশ করার বা প্রতিবাদ করার অধিকার যেমন রয়েছে, তেমনিভাবে রাষ্ট্রের কিছু কিছু ব্যাপারে তারও দায়িত্ব রয়েছে। যেমন, অনেক দেশে বিরোধী দল কোনো একটা ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ করে, এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আবার রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি তাদের অনুগত থাকতে হবে। ব্যক্তি অধিকার, স্বাধীনতা, কর্তব্য-এগুলো রাজনৈতিক ন্যায়ের বিষয়। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে রাজনৈতিক ন্যায়ের মূল লক্ষ্য। আর উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানে হচ্ছে যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার (মানবাধিকার) এবং রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

৪.২ নৈতিকতা বিষয়ক কতিপয় দার্শনিক চিন্তা

দার্শনিক চিন্তাচেতনার সাথে ন্যায়ের ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দার্শনিক স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়ের ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ন্যায়পরতা বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা পর্যালোচনা করলে সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজে বিদ্যমান ক্রিয়াশীল ধারণা এবং সেগুলোর মূল্যায়ন সব দার্শনিকের চিন্তায়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

৪.২.১ প্লেটোর ধারণাঃ

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থ হতে ন্যায়পরতা বিষয়ক তাঁর মত সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। ন্যায়পরতা বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সমাজের মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন-শাসক, সৈন্যবাহিনী ও উৎপাদক। এই বিভাজনের মানদন্ড হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জ্ঞান, সাহস ও সংযমকে। কারও দ্বারা অন্যের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ না করাকেই তিনি ন্যায় বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "প্রকৃতি যাকে যে কাজের জন্য উত্তমরূপে তৈরি করেছে সে সেই কাজই সম্পাদন করবে। আমি বলব: এই নীতিই হচ্ছে ন্যায়।"[১৮] তিনি যথার্থ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মতে, যথার্থ ন্যায়ভিত্তিক সমাজের শাসনকর্তা হবেন তিনিই যিনি প্রজ্ঞার আলোকে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। তৎকালীন গ্রীক নগররাষ্ট্রে অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ছিদ দাস। তাদের কোনো প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, প্লেটো দাস ব্যবস্থাকে একটি নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। দাস সমাজে বিদ্যমান শ্রম বিভাজনকে প্লেটো তার ন্যায়তত্ত্বে যৌক্তিক মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করেন। প্লেটো বলেন, "প্রত্যেক নাগরিক আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করে, অপরের কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করে না-শ্রমের সেই বিভাগ ন্যায়েরই প্রতিরূপ।"[১৯] তৎকালীন দাসভিত্তিক সমাজে বিদ্যমান শ্রম-বিভাজন নীতিকে প্লেটো যেভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তাতে মনে হয় তিনি তাঁর চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ক্রসম্যান (Crossman) বলেন, প্লেটোকে আমরা আইওনীয় মুক্ত চিন্তার বিরুদ্ধে দাস শোষণের সংকীর্ণতাবাদী ধ্বংসোন্মুখ নগররাষ্ট্রের শাসক শ্রেণির স্বার্থে একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।"[১৯]

প্লেটোর চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি আগে থেকেই মানুষের মধ্যে কতগুলো প্রাকৃতিক বৈষম্য ধরে নিয়ে দাস সমাজকে যৌক্তিকতা দিতে চেয়েছেন। দাস সমাজ ব্যবস্থার নৈতিক

ভিত্তির কথা বলে তিনি সে ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে ছেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ভলকভ বলেন, "নৈতিক গুণাবলীকে প্লেটো দাস সমাজ ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবহিকতা রক্ষার নিশ্চয়তা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন..."[২১] ন্যায়পরতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্লেটো পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তির গুণাবলীকে ভিত্তি করে সমাজ ও ইতিহাসে প্রবেশ করেন। ন্যায়পরতার ধারণার উৎসকে তিনি আত্মগতভাবে ব্যক্তির মধ্যে খুঁজেন এবং ন্যায়কে মানুষের অন্তরের ব্যাপার, তার যথার্থ আত্মার ব্যাপার[২২] বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, প্লেটোর ন্যায়পরতার ধারণা ছিল দাস-মালিক শ্রেণির পক্ষের নৈতিকতা। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্লেটো ন্যায়পরতার যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন তা একান্তই আত্মগত ও প্রাকৃতিক।

৪.২.২ এরিস্টটলের ধারণা

এরিস্টটল *পলিটিকস্* এবং *Nicomachean Ethics* এ ন্যায়পরতা বিষয়ক তাঁর মত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। *পলিটিকস্* গ্রন্থে বিবৃত ন্যায়পরতার ধারণায় তিনি দাস সমাজকে যৌক্তিকতা প্রদান করতে গিয়ে উত্তমের শাসনের কথা বলেন। দাস ব্যবস্থাকে তিনি অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের মতো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করেন। এরিস্টটলের মতে, "... কারুর আদেশ দান কর উচিত এবং অপর কারুর আদেশ মান্য করা উচিত ... বস্তুত: কতগুলো সৃষ্টি জন্ম থেকেই এভাবে বিভক্ত: এদের এক অংশ শাসনের জন্য, অপর অংশ শাসিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট।"[২৩] এরিস্টটল শাসক শ্রেণি কে সমাজের উত্তম শ্রেণি এবং নারী ও দাস শ্রেণিকে অধম হিসেবে অভিহিত করেছেন। নারী ও দাসদের কোনোস্বাধীন সত্তার কথা স্বীকার করেননি। প্রকৃতির দোহাই দিয়ে স্বাধীন নাগরিক থেকে দাস শ্রেণিকে পৃথক করতে গিয়ে তিনি বলেন, "...প্রকৃতি স্বাধীন নাগরিকের দেহ, দাসের দেহ থেকে পৃথকভাবে গঠন করেছে।"[২৪] এরিস্টটল মনে করেন, সমাজের কিছু মানুষ জন্মায় সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে আর কিছু মানুষ জন্মায় দাস হয়ে। এটা সর্ম্পণভাবে প্রাকৃতিক ব্যাপার। দাস শ্রেণীকে তিনি 'কর্ম সম্পাদনী হাতিয়ার' বলে বিবেচনা করেন। সম্পদ সংগ্রহের উপায় হিসেবে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের মাধ্যমে দাস শিকারকে তিনি প্রকৃতি নির্দিষ্ট ন্যায় যুদ্ধ বলে মনে করেন। এরিস্টটলের মতে, প্রকৃতি নির্দিষ্ট ভিন্নতা অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক মর্যদা ও সুযোগের যথার্থ বণ্টনই হচ্ছে ন্যায়পরতা এবং উত্তমের শাসনই যথার্থ ন্যায়। প্রাকৃতিকভাবে স্বাধীন নাগরিক, পরিবারগত আভিজাত্য, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক কর্তৃত্ব, নীতি নির্ধারণী অবস্থান-এ সবকেই এরিস্টটল দেখেছেন উত্তম নাগরিকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে।

এরিস্টটল বলেন, "...ন্যায়পরতা হচ্ছে সদগুণের সর্বোচ্চ পর্যায়... ন্যায়পরতা হচ্ছে একমাত্র গুণ যেখানে অন্যের ভাল-মন্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি অন্যের সাথে সম্পর্কিত, এখানে

দেখানো হয় কিসে অন্যের ভাল হয়, তা শাসকেরই হোক বা সমাজের সাধারণ সদস্যের হোক।"[২৫] এরিস্টটল সুখকেই ন্যায়পরতার ভিত্তি হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে, ন্যায়পরতা হলো তাই যা সুখ প্রদান করে।[২৬] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি আমার 'নীতিকথায়' যে ন্যায়কে ব্যাখ্যা করেছি তার সঙ্গে এই ন্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে এক, অর্থাৎ ন্যায় মানুষের সাথে সম্পর্কিত এবং সমানের জন্য সমান সমতা থাকতে হবে।"[২৭] সমাজের সবাইকে অবশ্য তিনি সমান বলে মনে করেননি। কারণ তিনি মনে করেন, সমাজের কিছু মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই স্বাধীন আর কিছু মানুষ দাস হিসেবে জন্মায় তিনি কেবল সমানের জন্য সমান নীতি অনুসরণের কথা বলেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, যারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির তাদের নীতিও হবে ভিন্ন ভিন্ন, আর সমশ্রেণিভুক্তদের জন্য যেকোনো নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ন্যায়পরতার আলোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল মানুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক ভিন্নতার কথা বলেছেন, তার ভিত্তিতে তিনি আসলে তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান শ্রম বিভাজন নীতিকেই ন্যায্যতা প্রদান করতে চেয়েছেন। মানব প্রকৃতির ভিন্নতার যুক্তি দিয়ে তিনি দাস সমাজ ব্যবস্থাকে নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। প্রাকৃতিক কারণে মানুষে মানুষে গুণাবলীর পার্থক্য আছে এ যুক্তি দিয়ে দাস ব্যবস্থার সমর্থনে এরিস্টটল নৈতিকতাকে শাসক শ্রেণির পক্ষে ব্যবহার করেছেন। প্লেটোর মতোই এরিস্টটল ব্যক্তির গুণাবলী থেকে সমাজ থেকে সমাজ ইতহাসে প্রবেশ করেন এবং সামাজিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করতে চান ন্যায়পরতার ভিত্তিতে।

৪.২.৩ কান্টের ধারণা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মনে করেন, ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকেই যাবতীয় নৈতিক কর্মকান্ডের উৎপত্তি হয়। তিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির ওপর ন্যায়পরতাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর ন্যায়পরতার ধারণায় প্রকৃতিবাদী দাস নৈতিকতা এবং মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক নৈতিকতার বিরোধিতা করেন। কান্ট মনে করেন, যথার্থ নৈতিক আচরণ একটি সার্বিক সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সূত্রের নির্দেশ এরকম: "এমন নিয়মানুসারে কাজ কর, যে নিয়মকে তুমি একটি সর্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে ইচ্ছা করতে পার।"[২৮] অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তির আধিপত্য ও বুর্জোয়া সমাজের স্বাধীন ব্যক্তির ধারণা দ্বারা কান্ট প্রভাবিত ছিলেন এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে তিনি সমর্থন করতেন। ব্যক্তি স্বার্থের জন্য একজন মানুষ আরেকজনকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করেবে, তিনি এ ধারণার বিরোধী ছিলেন। 'মানুষ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য কখনই উপায় নয়', কান্ট এই যুক্তির মাধ্যমে উদার-নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৯] কর্তব্যের বশবর্তী হয়ে কর্ম সম্পাদনকেই কান্ট নৈতিক বলে বিবেচনা করেন। কান্ট বলেন, কোনো কাজের পেছনে সদিচ্ছা না থাকলে সে কাজকে কর্তব্যবোধ ও যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলা

যায় না। সদিচ্ছাকেই তিনি নৈতিকতার প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করতেন। ব্যক্তি-ভিত্তিক কর্মনীতির পরিবর্তে কান্ট সর্বজনীন নৈতিকতার কথা বলেন। কান্ট মনে করেন, বুদ্ধি থেকেই সর্বজনীন নৈতিকতার উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কোনো ভূমিকা নেই। বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমেই সর্বজনীন নৈতিক আইন তৈরি করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। কান্ট বলেন, "...যুক্তিবৃত্তির মধ্যেই যাবতীয় নৈতিক ভাবের উৎস ও উৎপত্তি, এবং নৈতিক ভাব ও সত্যগুলো একান্তভাবেই অভিজ্ঞতামুক্ত।"[৩০] মানুষে মানুষে প্রাকৃতিক পার্থক্যের কথা বলে প্লেটো ও এরিস্টটল যে ধরনের ন্যায়পরতার কথা বলেন কান্ট তা প্রত্যাখ্যান করেন। কান্ট ইচ্ছার আত্মনিয়ন্ত্রণকে নৈতিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতার সামগ্রিক গঠনকে স্বাধীনতার ধারণার ওপর দাঁড় করান। কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা বাহ্যিক কোনো নিয়ন্ত্রণকারী ব্যতিরেকেই কার্যকরী হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। মানুষের স্বাধীনতা বাহ্যিক কোনো নিয়ন্ত্রণকারী ব্যতিরেকেই কার্যকরী হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। কান্ট মানুষের স্বাধীনতাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন এবং যুক্তি দিয়েই ন্যায়পরতাকে আবিষ্কার ও বাস্তবায়ন করতে চান।

বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে কান্ট নৈতিকতার যে অভিজ্ঞতাপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা একন্তই আত্মগত। কান্টের উদ্দেশ্য ছিল, সব যুগের, সব মানুষের এবং সব অবস্থার পক্ষে উপযোগী নৈতিকতার প্রচার। তিনি যে সর্বজনীন নৈতিক আইনের কথা বলেছেন বাস্তবে তা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ মানব সমাজের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নৈতিকতা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার সমাজে যেহেতো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির লোকের বাস সেহেতু সবাই একই সর্বজনীন নৈতিকতার অনুসারী হতে পারে না। শ্রেণি বিভক্তির কারণে তাদের স্বার্থ ও নৈতিকতা পৃথক পৃথক। বাস্তবে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পেশা, প্রতিটি শ্রেণি, প্রতিটি সমাজের নিজস্ব নৈতিক আদর্শ রয়েছে। কান্ট বাস্তব ইতিহাস বিবেচনায় না এনেই নৈতিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নৈতিকতাকে বাস্তবতার আলোকে না দেখে তিনি নৈতিকতার উৎস অনুসন্ধান করেছেন। অভিজ্ঞতার জগৎকে তিনি তাঁর নৈতিকতার অধিবিদ্যায় নাকচ করে দেন। এ কারণেই কান্টের নৈতিকতা বুদ্ধি ও যুক্তির জগতে সীমাবদ্ধ এবং তা বাস্তব ফল প্রদানে অক্ষম।

৪.২.৪ হেগেলের ধারণা

হেগেল *The Philosophy of Right* গ্রন্থে ন্যায়পরতা বিষয়ক তাঁর মত তুলে ধরেন। তিনি ইতিহাসকে চিন্তার যৌক্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন।[৩১] নৈতিকতাকে বাস্তব ইতিহাসে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি নৈতিক স্বাধীনতার সামাজিক বাস্তবায়নের কথা বলেন। অধিকার দর্শনের আলোচনায় হেগেল

অধিকারের ধারণাগত ও বাস্তব মূর্তায়ন-এ দুটি দিককে একত্রে অধিকার বিষয়ক দার্শনিক নীতি বিজ্ঞানের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, "দার্শনিক নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো অধিকারের ধারণা অর্থাৎ অধিকারের ধারণার সাথে সাথে তার বাস্তবায়ন।"[৩২] হেগেল নৈতিকতার প্রত্যয়গত দিকের চেয়ে এর সামাজিক ও বস্তুগত দিকের ওপর গুরুত্ব দেন। হেগেলের মতে, নৈতিকতা বা অধিকারের মর্মবস্তু হলো স্বাধীনতা। তিনি স্বাধীনতার বাস্তবায়নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এ কারণে তিনি মনে করেন, মালিকানার মধ্যে দিয়েই বিমূর্ত স্বাধীনতা বাস্তব হয়ে ওঠে। হেগেল বলেন, মানুষ বস্তুকে নিজের করে না পেলে স্বাধীনতাকে বাস্তব করে তুলতে পারে না। কোনো কিছুকে মানুষ যখন নিজের করে পায় তখনই আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঘটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অধিকারের বিষয় হলো বস্তু এবং বস্তুর ওপর মানুষের অধিকার। বস্তুর ওপর অধিকার বাস্তবায়ন সম্পত্তির আকারেই ঘটে। এ কারণেই হেগেল বলেন, "…. অধিকারের চরম বাস্তবতা যেটাকে মানুষ অন্য সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয় তা হলো সম্পদ, যা কিনা অধিকারের সর্বোত্তম মানদন্ড।"[৩৩] হেগেল বস্তুর ওপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অধিকারের কথা বলেন। কারণ এভাবেই কেবল বিমূর্ত স্বাধীনতা বাস্তবতা পায়। তাঁর মতে, অধিকার বাস্তবায়িত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্য দিয়ে। কাজেই সম্পত্তি হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রথম ধাপ কিন্তু ইচ্ছা প্রথমত একজন ব্যক্তির ইচ্ছা, তাই এটা হলো একক ইচ্ছা। হেগেলের মতে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির লক্ষ্য হলো একক ইচ্ছা এবং সে কারণে সম্পত্তি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অধিকার, স্বাধীনতা, পরিতৃপ্তি প্রভৃতির কথা বলে হেগেল মূলত ব্যক্তিগত মালিকানাকে ন্যায্যতা দিতে চেয়েছেন। নৈতিক জীবন বলতে তিনি স্বাধীনতার বিকাশকে বুঝিয়েছেন, যার বিকাশ ঘটে আত্মসচেতনতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তিনি বলেন, এ বিকাশ ঘটে পর্যায়ক্রমে।

হেগেলের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এবং তা অর্জনের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে সমাজে স্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্বার্থপরতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা থেকে সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে সমাজে কোনো যৌক্তিক ও সর্বজনীন নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ কারণে হেগেল ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রতিযোগিতার সম্পর্কের উর্ধ্বে অবস্থানরত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের কথা বলেন। তিনি বলেন, নাগরিক সমাজ নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের অবসান নাগরিক সমাজে সম্ভব হয় না। তাঁর মতে, কেবল রাষ্ট্রেই যুক্তির মাধ্যমে সবকিছুকে বিচার করা সম্ভব এবং এখানেই আমরা সবকিছুর একটি সমন্বিত রূপ পাই। কাজেই রাষ্ট্রেই নৈতিক চিন্তার বাস্তবায়ন সম্ভব। হেগেল বলেন, "নৈতিক ধারণাবলীর বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে রাষ্ট্র…রাষ্ট্র হচ্ছে পরমভাবে যৌক্তিক…"[৩৪]

Herbert Marcuse হেগেলের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "... হেগেল তাঁর অধিকারকেন্দ্রিক নীতিচিন্তায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে একটি আধিবিদ্যক ন্যায্যতা প্রদান করতে চেয়েছেন।[৩৫] হেগেল আসলে পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাকে একটি নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বার্থের দ্বন্দ্বকে নাগরিক সমাজ কাঠামোর মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে তিনি বিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে নৈতিক মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তিনি নৈতিকতার ধারণার ভিত্তি হিসেবে ধরে নেন চিন্তা ও স্বাধীনতার ধারণাকে এবং চেতনার ধারণার মাধ্যমে সমাজ ইতিহাসে প্রবেশ করেন। তাই হেগেলের নৈতিক চিন্তার পদ্ধতি ভাববাদী। হেগেল মূলত তাঁর অধিকারকেন্দ্রিক ন্যায়পরতার ধারণায় পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, আত্মস্বার্থের কারণে সামাজিক বিরোধ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

ন্যায়পরতা বিষয়ক উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে ন্যায়ের ধারণা বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ককে নৈতিক মর্যাদা দিতে চেয়েছে। ফলে তা তৎকালীন সমাজের আধিপত্যশীল শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করে। প্লেটো এবং এরিস্টটল তাদের ন্যায়পরতার ধারণায় দাস সমাজে বিদ্যমান দাস-মালিক সম্পর্ককেই নৈতিক ন্যায্যতা দিতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেন, "রাষ্ট্রের উৎপাদনমূলক নীতিস্বরূপ, প্লেটোর বিপারলিক- এ যতটুকু শ্রম বিভাজন আলোচিত হয়েছে, তা মিসরীয় বর্ণ প্রথারই এথেন্সীয় ভাবরূপ..."।[৩৬] কান্ট ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণাকে রূপদান করেছেন তার ন্যায়পরতা বিষয়ক মতবাদে। হেগেল আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তি মালিকানার ধারণাকে নৈতিক আধিবিদ্যক ন্যায্যতা দিতে চেয়েছেন। হেগেল নাগরিক সমাজে বিদ্যমান বিরোধের নৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন নৈতিক ভাবের বাস্তব রূপায়ণ হিসেবে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে। ন্যায়পরতা বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা নৈতিকতার যথার্থ উৎসকে বিবেচনা না করেই, ন্যায়পরতার ধারণা দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। প্লেটো ও এরিস্টটল যেভাবে মানুষের প্রাকৃতিক ভিন্নতার কথা বলেন, পদ্ধতিগতভাবে তা প্রকৃতিবাদী আত্মকেন্দ্রিকতা। কান্ট বিশুদ্ধ যুক্তি থেকে উৎপাদিত যে ন্যায়ের কথা বলেন তা বিমূর্ত, যুক্তিবাদী ও অপ্রায়োগিক। হেগেল চিন্তা ও স্বাধীনতার ধারণা থেকে নৈতিকতার উদ্ভবের কথা বলেন। এ কথা স্পষ্ট যে, গতানুগতিক চিন্তায় দার্শনিকেরা উৎপাদন সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ন্যায়পরতার ধারণা গঠন করেননি। তাঁরা ন্যায়পরতার ধারণা দিয়ে সামাজিক বাস্তবতাকে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন এবং নৈতিকতাকে সমাজ উৎস নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। সুতরাং বলা যেতে

পারে, ন্যায়পরতার ধারণা সমাজের আধিপত্যশীল শ্রেণির ধারণা যা সমাজের বাস্তব অবস্থাকে আড়াল করে বিদ্যমান সমাজের ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করেছে।

নৈতিকতা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত দার্শনিক আলোচনা ছাড়াও মানবাধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে নৈতিকতা বা ন্যায়পরতা কীভাবে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তা স্পষ্ট করার জন্য সাম্প্রতিককালের দুজন প্রভাবশালী দার্শনিক জন রলস্ ও রবার্ট নজিক এর তত্ত্ব তুলে ধরা যায়।

৪.৩ রলসের ন্যায়তত্ত্বে অধিকারের ধারণা

সাম্প্রতিককালে ন্যায়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী মত হলো রলসের[৩৭] মত। রলস ন্যায় সম্পর্কিত চিরায়ত উপযোগবাদী মতবাদকে খন্ডন করেন এবং কান্টের নৈতিক সমতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজই যথার্থ সমাজ যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। রলস মনে করেন, যখন সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখনই ন্যায়ের প্রশ্নটি আসে। এই দ্বন্দ্বের মিমাংসার পথ হিসেবেই তিনি বণ্টনমূলক ন্যায়ের কথা বলেছেন। রলসের মতে ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূরণ এবং উত্তম জীবন যাপনের উপায় হচ্ছে ন্যায়।[৩৮] ন্যায় ছাড়াও সমাজে আরও অনেক ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে। এসব মূল্যবোধগুলো ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপাদান হিসেবে কাজ করে।

রলস মনে করেন, সমাজের ব্যাক্তিবর্গ ন্যয়পরতার যথার্থ ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ। নিজেদের লাভালাভের ধারণা বা ব্যক্তিস্বার্থের ধারণা তাদের একজনকে অপরজন থেকে আলাদা করে না, কেননা সবাই চায় সর্বোচ্চ পরিমাণে লাভবান হতে। রলস মনে করেন, ন্যায়পরতা বিষয়ক জ্ঞান তাদেরকে আলাদা করে থাকে। সমাজের সদস্যরা মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সমাজে ন্যায়পরতার ধারণার স্রষ্টা। কাজেই যৌক্তিক কারণেই ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক চিন্তার উন্নতি সাধনের জন্য এক ধরনের অনুপ্রেরণার দরকার আছে। এ অনুপ্রেরণা তাদের গতানুগতিক চিন্তাধারা উন্নয়নের জন্য নয় বরং ন্যায়পরতা বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তিতে কীভাবে ব্যক্তি সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করবে সে অনুপ্রেরণা।

সাধারণত ব্যাক্তির চাহিদা গড়ে ওঠে এমন নীতির ভিত্তিতে যার সাথে সমাজে বিদ্যমান বণ্টন নীতি ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বৈপরীত্য আছে। রলস মনে করেন, কোনোকিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে বা পছন্দ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সে বাস করে সুন্দর, সাজানো গোছানো, এবং নিয়মতান্ত্রিক একটি সমাজে। সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে এমন কতগুলো বিষয় জড়িত যেগুলো ন্যায়পরতার ধারণার সাথে সাথে ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য। দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তি চিন্তা করে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে এবং সেই বলয়েই সে আবর্তিত হয়। এখানে ব্যক্তি কাজ করে ন্যায়পরতার প্রাথমিক নীতির ভিত্তিতে। কাজেই যে সমাজে ন্যায়পরতার নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেখানে ন্যায়ের সাধারণ ধারণা বিদ্যমান থাকতে হবে যাতে সমাজের ব্যক্তিবর্গ নিয়মকানুন সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন থাকে, প্রয়োগযোগ্য নীতিমালাকে ন্যায়সম্মত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে সেগুলো মেনে চলতে পারে। আবার সমাজের সদস্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক সমঝোতা

থাকতে হবে যে, তারা সবাই স্বাধীন এবং মোটামুটি একই নৈতিক চেতনাসম্পন্ন। আর এভাবেই উৎপাদিত দ্রব্য বা সম্পদের বৈধ উৎস বিবেচনা করে বণ্টনের মধ্যমে জনগণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। রলস মনে করেন, এ ক্ষেত্রে যদি সাধারণ জনগণ সহযোগিতা করে তবে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ বা বণ্টনমূলক যেকোনো ব্যবস্থা হবে নিরপেক্ষ ও যথার্থ।

ন্যায়পরতার সাধারণ ধারণাকে রলস অধিকারের পদ্ধতিগত ধারণার সাথে এক করে দেখেন। ন্যায়পরতা বিষয়ে জনসাধারণের মত হলো, ন্যায়ের নীতি হবে সাধারণ বা সার্বিক, জনসাধারণের জন্য প্রযোজ্য এবং যার সাহায্যে সার্থকভাবে ও সর্বজনীনভাবে সামাজিক সব ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এভাবে রলস আইনের কিছু মৌলিক নীতির কথা বলেন যেগুলো সমাজে সমতা বিধান করে এবং সর্বজনীন ন্যায় নির্ধারণ করে। অধিকারের ধারণায় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার কোনো স্থান নেই তবে এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা সর্বাগ্রে স্থান পায়। আরো নিশ্চিত করে বলা হয় যে, ব্যক্তি এমনিতেই কোনো সুবিধা পাবে বা বিশেষ কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো সুবিধা পাবে এমন কোনোব্যবস্থা এখানে নেই। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ন্যায়ের নীতিকে যদি সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তাহলে সমাজের সদস্যদেরকে সমাজে বিদ্যমান সাধারণ নীতিমালা বেছে নিতে হয় যেখানে তাদের অধিকার, পছন্দ, কর্তব্য এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে ন্যায়পরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে একই ধরনের ঘটনাগুলোকে একইভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সমাজে বিদ্যমান নৈতিক আদর্শকেই এক্ষেত্রে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভাজন তৈরির যে উপাদান আছে তা যদি সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, তাদের মধ্যে বিতর্ক হওয়ার মতো আর কিছু থাকে না। এমতাবস্থায় সমাজের সকলে একই ধরনের উপাদান নিয়ে চিন্তা করে, সকলে একই রকম প্রেরণা অনুভব করে এবং সকলের সামর্থও থাকে একই রকম। রলস মনে করেন, দুটি শ্রেণি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখনই যখন তাদের মধ্যে মতের অমিল থাকে। অবশ্য এটা পরিষ্কার নয় যে, কিসের ওপর নির্ভর করে এসব মতানৈক্য গড়তে পারে। রলস মনে করেন, উত্তম জীবনের জন্য তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন-মৌলিক স্বাধীনতা (basic liberties) এবং মুখ্য উপাদান (primary goods)।[৩৯]

মৌলিক স্বাধীনতা বলতে সর্বক্ষেত্রে কাজের স্বাধীনতাকে বোঝায় বা বৈষম্য দূর করার অধিকারকে বোঝায়। এ স্বাধীনতা নাগরিক অধিকারের অনুরূপ। মূখ্য উপাদান বলতে রলস বোঝান সামাজিক ক্ষমতাকে। সম্পদ থেকে উদ্ভূত ক্ষমতা বা পদমর্যাদা থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা সামাজিক ক্ষমতার অন্তর্গত। মূখ্য উপাদানগুলো এমন সামাজিক পটভূমি যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ব্যক্তির নৈতিক ক্ষমতার উন্নয়ন এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ। নৈতিক ক্ষমতা বলতে এখানে ভাল-এর ধারণাকে বোঝায় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় মৌলিক স্বাধীনতার ধারণা। যেমন- চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, নৈতিক চেতনার বিকাশ, চলাফেরার স্বাধীনতা, ব্যক্তির পেশা, আয় ও সম্পদ অর্জনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির আত্মমর্যাদা রক্ষার স্বাধীনতা। এগুলোর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে নৈতিক চেতনার বাহক হিসেবে অনুভব করে। প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি যেগুলো অর্জনের চেষ্টা করে সেগুলো নয় বরং তার মাধ্যমে ব্যক্তি যা পেতে চায় সেগুলোই মূখ্য উপাদান।

রলসের মতে, মূখ্য উপাদান কোনগুলো এবং কিভাবে এগুলো অর্জন করা যাবে সে সম্পর্কে ব্যক্তির পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে এবং এগুলো অর্জন করার জন্য ব্যক্তির তাগিদও রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, এসব মূখ্য উপাদানগুলোকে কীভাবে বণ্টন করা হবে ? রলস মনে করেন, এক্ষেত্রে বণ্টনের নীতি নির্ধারণকারীকে খুবই সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। কেননা সমাজের মৌলিক নীতির মতো বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলা হচ্ছে। বণ্টনের নীতি নির্ধারণকারীকে এখানে কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়। রলস মনে করেন, তারা কোনো প্রকার অসম নীতির আশ্রয় নেবে না বরং এমন নীতি অবলম্বন করবে যাতে তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হয়।

রলস বলেন, মৌলিক স্বাধীনতার যে বিষয়গুলো সমানভাবে বণ্টন করা উচিত এবং যেগুলো অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ের আগে স্থান পায় সেগুলো আংশিকভাবে মূখ্য উপাদানের অন্তর্গত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি এই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু রলস ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে গণতান্ত্রিক অধিকার দরকার তার উপরে মৌলিক স্বাধীনতাকে স্থান দেন। তাঁর মতে মৌলিক স্বাধীনতার অবস্থান ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আইনগত যেকোনো অধিকারের উর্ধ্বে। কিন্তু এর সবগুলোর উপরে তথা সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা।[৪০] রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণাই ব্যক্তিকে যেকোনো অগ্রহণযোগ্য ও অনাকাঙ্খিত অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সবার উপরে স্থান দেয়া হয় কারণ এটি আইনসম্মত এবং দৃঢ়। কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিই নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীকে অগণতান্ত্রিক পরিবেশে বিবেচনা করতে রাজি হবেন

না। কারণ এতে স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার সাথে সাথে লজ্জিত হওয়ারও ভয় থাকে। রলস মনে করেন, মৌলিক স্বাধীনতার কোনো একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যেতে পারে কেবলমাত্র অন্য একটি মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়কে রক্ষার স্বার্থেই। কোনো অর্থনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করেই মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে ছাড় দেয়া যাবে না। তবে যেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নেই বা যেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সুনির্দিষ্টভাবে অতিশয় নিম্নমানের সেখানে মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে চিন্তা করা যায় না। ন্যায়ের উক্ত দুটি মানদন্ডের মধ্যে অনিবার্য দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব মিমাংসার জন্য রলস বলেন, আগে আসবে মৌলিক স্বাধীনতা, পরে আসবে মূখ্য উপাদান। তিনি বলেন দ্রব্য সামগ্রী সীমিত। কাজেই তা বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। আর যদি সমতা বিধান সম্ভব হয় তবেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

রলস তাঁর ন্যায়তত্ত্বে ন্যায়ের মূলসুত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ন্যায়ের এমন সূত্রের কথা বলেন যার ওপর ভিত্তি করে সমাজের একটি পরিপূর্ণ কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব। এই মূলনীতি হবে বণ্টনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ব্যক্তি তার বাস্তব অবস্থান থেকে এগুলো মেনে নেবে। এই বাস্তব অবস্থান হবে অনিশ্চয়তার একটি শর্ত। রলস মনে করেন, এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে দুটি নীতি স্বীকৃত বলে বিবেচিত হবে। প্রথমত: মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়ত: সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসমতাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে সবাই সমান অধিকার পায় এবং সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে সবাই সমানভাবে বিবেচিত হয়। রলস বলেন, নীতি দুটির প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৪১] এরপর তিনি কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কাঠামো যাচাই করার মধ্যে দিয়ে এ মূলনীতিগুলোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি এ দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে সাংবিধানিক চুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। ব্যক্তিবর্গ যখন বিশেষ বিশেষ আইন ও নীতির প্রতি একমত হয় তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেকোনো ধরনের সংবিধানের জন্যই এ নীতিগুলোর প্রয়োজন। রলস দ্বিতীয় নীতিটির প্রথম অংশে যা বলেছেন তা দ্বারা তিনি আসলে দক্ষতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এখানে যে বিষয়টির প্রস্তাব করা হয়েছে তা হচ্ছে মূখ্য উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা যাতে বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় থাকে। এখানে রলস আবার ভিন্নতার নীতির কথা বলে কিছু অসমতার বিষয়কেও স্বীকৃতি দিয়েছেন যাতে অক্ষম লোকেরা কিছুটা উপকৃত হতে পারে। রলস বলেন, ভিন্নতার নীতির চেয়ে সমতার নীতিটি অগ্রাধিকার পাবে। তিনি মনে করেন কোনো মৌলিক স্বাধীনতার ধারণাকে যদি সমবণ্টনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয় তাহলে অন্যান্য কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে অসম বণ্টনের সম্ভাবনা থাকে যদি বিষয়গুলো

সর্বাগ্রে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এজন্য বণ্টনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রলস খুবই সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

রলসের মতে, যথার্থ ন্যায় অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে তার নিজের অবস্থানে অবশ্যই থাকতে হবে এবং সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সমতা থাকতে হবে।[৪২] স্বাধীনতা বলতে তিনি শুধু এটা বোঝাননি যে, ব্যক্তি তার নিজের অবস্থানে অন্য কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং সে সামাজিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বশাসিত। পূর্ব নির্ধারিত কোনো নৈতিক ধারণা দ্বারা তারা নিজের কাজের ক্ষেত্রে বা নিজের ভালোমন্দ বিবেচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। রলস ব্যক্তিকে স্বার্থবাদী হিসেবে মেনে নেননি। কেননা তিনি মনে করেন, ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে না। ব্যক্তির এই অবস্থানকে রলস নৈতিক স্বাধীনতা বলেন এবং এটাকে কান্টের শর্তহীন আদেশের ধারণার মতো একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন।

সমতা বলতে রলস প্রাথমিকভাবে স্বাধীনতার সমতার কথা বলেছেন, যেখানে ব্যক্তির প্রথাগত অধিকার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক সম্পদের প্রতি ব্যক্তির যৌক্তিক দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি মনে করেন, সমাজে প্রত্যেক সদস্যের মূল্যই সমান এবং প্রত্যেকেই নৈতিক গুণসম্পন্ন। কাজেই সমাজে সবাইকে একই মানদন্ডে বিচার করতে হবে এবং প্রত্যেকে সমান মর্যাদার সাথে অবস্থান করবে।[৪৩] সমতার এ ধারণাটি একেবারে বিমূর্ত নয়। ব্যক্তির সমতার ধারণাকে রলস নৈতিক সত্তার ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ভালোর একটা ধারণা আছে অর্থাৎ ব্যক্তির কোনো চাওয়াগুলো ন্যায্য সে বিষয়ে সে সচেতন। আবার ব্যক্তির মধ্যে ন্যয়পরতার একটি দিক রয়েছে অর্থাৎ নিরপেক্ষ সামাজিক সম্পর্কের প্রতি তার বিশ্বাস আছে। এদিক থেকে বলা যায় নৈতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য ব্যক্তির যে পরিমাণ নৈতিক গুণ থাকা আবশ্যক তা নিজের মধ্যে আছে বলে যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এক ধরনের সমতার ধারণা আছে।

সাধারণত সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থ থাকলে সেখানে ন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে । যদি পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে তাহলে ন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না। তাই রলস সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে এই পারস্পরিক স্বার্থের বিরোধিতা দূর করার কথা বলেছেন। চুক্তিকালীন সময়ে ব্যক্তির অবস্থানকে তিনি নৈতিক ও বৌদ্ধিক সত্তা বলেছেন। ব্যক্তি এখানে মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি পরিচালিত হয় যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এবং ন্যায়পরতার নীতির ভিত্তিতে। রলস বলেন, সবকিছু সমানভাবে বণ্টন

করলে যে বেশি কাজ করে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তারাও কম কাজ করে। এসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রলস ভিন্নতার নীতির কথা বলেন, এই নীতি অনুযায়ী কম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাও যাতে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সে ব্যবস্থা করতে হবে।[৪৪] এখানে চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্ভাব্য ক্ষতির ব্যাপারে সচেতন থাকে এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়েও তাদের শঙ্কায় থাকতে হয় না। উপযোগবাদী নীতি[৪৫] অনুযায়ী মূখ্য উপাদানগুলোকে সর্বাধিক লাভের দিক বিবেচনা করে বণ্টন করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এক ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক উপাদানের বণ্টনের ক্ষেত্রে উপযোগিতার নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের ঝুঁকি থেকে যায়। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে মন্দ ভাগ্যের অবস্থায় পতিত হওয়ার আগে বণ্টনের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়াই ভালো। আর তাছাড়া উপযোগবাদের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়। তাই রলস সর্বাধিক উপযোগিতার মতবাদকে গ্রহণ করেননি। তিনি এসব সমস্যার এক ধরনের সমতাবাদী সমাধান দিয়েছেন। সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গ কখনই তাদের অবস্থানের অসমতাকে মেনে নেবে না। কেননা তারা ঐসব বিশেষ অবস্থায় কোনো প্রতিযোগিতাও করতে পারবে না এবং প্রকৃতপক্ষে সমানও হতে পারবে না। এখানে যে শুধু বৈধ অধিকারেরই সমতা দরকার তা নয়, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দক্ষতার উন্নয়নের জন্য শিক্ষাগত ও বস্তুগত উপাদানেরও দরকার আছে। এর অর্থ এই নয় যে, সমাজে শুধু সবচেয়ে যোগ্যদেরকেই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এর জন্য দরকার গ্রহণযোগ্য দক্ষতার।

রলসের লক্ষ্য ছিল, সমাজে ন্যায়ের ভূমিকা উপলব্ধি এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য একটা পদ্ধতির প্রচলন করা। এ পদ্ধতিটি হবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজের রাজনীতির প্রতিরূপ। এ্যাডাম স্মিথের "আদর্শ পর্যবেক্ষকের তত্ত্ব" অথবা কান্টের "সর্বজনীনতা তত্ত্বের"[৪৬] মধ্যে সমাজে ব্যক্তিকে সামগ্রিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে বলে রলস মনে করেন। রলস ব্যক্তির স্বতন্ত্র সুখ ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন, সমষ্টিগত সুখ ও স্বাধীনতার কথা বলেননি। এজন্য তিনি যে পদ্ধতির কথা বলেন তা স্মিথ এবং কান্টের তত্ত্বে যে বিকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে ভিন্নধর্মী এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা রলস মনে করেন, সমাজে অগ্রাধিকার, সুযোগ বা প্রাপ্যতা নিয়ে যখন দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন সামাজিক চাহিদার সাথে মিল রেখে কিছু সমন্বিত নীতি প্রয়োগ করা দরকার হয়। এসব নীতির প্রয়োগের মাধ্যমেই সব ধরনের বণ্টনমূলক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কারণ এসব নীতির অধিকারগত একটা সর্বজনীন মানদন্ড আছে। এজন্য রলস মনে করেন, তাঁর মতবাদ উপযোবাদের একটি উন্নততর বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

রলসের লক্ষ্য ছিল ন্যায়ের এমন একটি ধারণার প্রবর্তন করা যেটি সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং লক ও রুশোর[৪৭] সামাজিক চুক্তি মতবাদের একটি উন্নততর রূপ। তিনি মনে করেন এজন্য আমাদেরকে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজের কোনো চুক্তিতে প্রবেশ করতে হবে না। আমাদেরকে যেটা করতে হবে তা হলো চুক্তির ক্ষেত্রে ন্যায়পরতার নীতিকে সমাজের মৌলিক অবকাঠামো হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী স্বাধীন ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং সমাজের সদস্য হিসেবে তারা সমতার সাময়িক ধারণাকে মেনে নেবে। চুক্তির ক্ষেত্রে বারবার এই নীতিগুলোই আসবে। এই নীতি গুলোই সামাজিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করে এবং কোনো ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তা নির্দেশ করে। ন্যায়পরতার নীতিকে এভাবে গ্রহণ করার এবং বাস্তবে প্রয়োগ করার বিষয়টিকেই রলস স্বচ্ছতার নীতি হিসেবে ন্যায়পরতা বলে অভিহিত করেছেন।

এখন আমাদের দেখতে হবে, যারা সামাজিক পটভূমিতে যৌথভাবে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে কোনো নীতিগুলোর মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে এবং সামাজিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বণ্টনের নীতিই বা কি হবে। সমাজের সদস্যদের আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, অন্যদের তুলনায় নিজেদের দাবিকে বা প্রাপ্তির অধিকারকে তারা কিভাবে নির্ধারণ করেবে আর সমাজের মৌলিক আকারই বা কি হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোনো কোনো বিষয়গুলো তার জন্য ভালো, তেমনিভাবে সমষ্টিগতভাবে সবার জন্য কোনটি ন্যায় এবং কোনটি অন্যায় তা সবাই মিলেই ঠিক করবে। যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিলিতভাবে সমতা এবং স্বাধীনতার অবস্থান থেকে নীতি নির্ধারণ করবে এবং তারা ধরে নেবে যে তাদের নির্ধারিত নীতিতেই বণ্টন সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর তা যদি হয় তবে সেটাই হবে ন্যায়ের নীতি।

রলস মনে করেন, স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসাবে ন্যায়পরতার ধারণা শুরু হয় সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে।[৪৮] অর্থাৎ ন্যায়পরতার ধারণার প্রাথমিক নীতির ভিত্তিতেই পরবর্তী সব ধরনের আলাপ আলোচনা এবং যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পূণর্গঠনের কাজ করা হয়ে থাকে। তারপর ন্যায়পরতার সুনির্দিষ্ট একটা ধারণা নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে সংবিধান গঠন, রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন এবং এই ধরনের যাবতীয় কাজ করা হয়।

রলস নৈতিকতাকে মানবিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়তত্ত্বে ব্যক্তির অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকার প্রত্যয়টি দ্বারা তিনি নাগরিক অধিকারকে বুঝিয়েছেন। তবে তিনি নাগরিক

অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রলসের চিন্তা-চেতনা ঐ সমস্ত জনসমস্টিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে যারা রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। অধিকারের যে একটা সর্বজনীনতা আছে সেটা তিনি স্পষ্ট করেছেন। অধিকার সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, সকল আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদেরই যথার্থ অধিকার ভোগ করা উচিত। রলস মনে করেন, অধিকার, কর্তব্য, পছন্দ ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই যথার্থ নৈতিক সমাজে ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারিত হয়।[৪৯] নৈতিক মানবিক অধিকার কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এটি মানবতার জন্য সর্বজনীন।

রলস ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টিকে একটি নৈতিক বিষয় হিসেবে দেখেন। স্বাধীনতার ধারণাটিকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করে দেখান। প্রথমভাগে স্বাধীনতা বলতে তিনি সমাজে ব্যক্তির অবস্থানের স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। আর দ্বিতীয়ভাগে স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সামাজিক সুবিধা ভোগের দিকটিকে।[৫০]

রলস মনে করেন, ব্যক্তি যখন তার নিজ উদ্দেশ্যকে নির্বিঘ্নে অর্জন করতে পারবে তখন সে অবস্থাটাই হবে স্বাধীনতার অবস্থা। স্বাধীনতা প্রত্যয়টিকে তিনি বিশেষভাবে মৌলিক স্বাধীনতা অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, মৌলিক স্বাধীনতার অবস্থান ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং আইনগত যে কোনো ধারণার উর্ধ্বে। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে গণতান্ত্রিক অধিকার দরকার হয় তার ওপর মৌলিক স্বাধীনতার ধারণা বিরাজমান। রলস মনে করেন, সমাজে যথার্থ অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজের সদস্যদের সব ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতা ভোগ করা উচিত এবং মৌলিক স্বাধীনতার মত বিষয়গুলো সমানভাবে বণ্টন করা উচিত।

রলস পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যৌক্তিক মনে করেন। তিনি যে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তার যেকোনো সীমাবদ্ধতাকে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মানদন্ড দ্বারাই বিচার করার কথা বলেন। রলস ন্যায়ভিত্তিক সমাজের যে মডেলের কথা বলেন তা হলো একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্র, যেখানে সরকার একটি নির্দিষ্ট উপায়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি পরিচালনা করেন। তিনি মনে করেন বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক রাখার জন্য যদি আইন এবং সরকার যথাযথভাবে কাজ করে, উৎপাদনের উৎসকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, সম্পদ এবং উৎপাদিত দ্রব্য যদি সময়ে সময়ে সঠিকভাবে বন্টিত হয়, সামাজিক সম্পর্ক ন্যূনতম সন্তোষজনক অবস্থানে থাকে এবং সুযোগের সমতা বিরাজ করে তাহলে সেখানে গৃহীত বণ্টন ব্যবস্থাকে বলা হয় ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন। রলস মনে করেন, যে কোনো পুঁজিবাদী

সমাজ অবশ্যই শ্রেণিভিত্তিক সমাজ হবে এবং এরূপ সমাজে আয়ের অসমতা একটি অনিবার্য বিষয়। কাজেই এরূপ সমাজে সমতা বিধানের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।[৫১] ক্ষতিপূরণ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সমাজের কম উৎপাদনসম্পন্ন লোকেরাও যাতে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সে ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে বোঝাতে চান, এ জাতীয় অধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রধানত সরকারের। কিন্তু কল্যাণমুখী সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তিও তার দায় এড়াতে পারেনা। তিনি মনে করেন কল্যাণমুখী সমাজে ক্ষতিপূরণের এ ব্যবস্থা অবশ্যই স্বল্প পরিমাণে বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। কেননা, ক্ষতিপূরণের এ ব্যবস্থা প্রতিযোগিতার মনোভাবকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থার হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই, কেননা যারা প্রকৃতিকভাবে দুর্বল বা শারীরিকভাবে অক্ষম তারা বণ্টনের সময় কম পেলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। রলসের মতে, তারপরও সেখানকার অবস্থাটা এমন হবে যে, সমাজের একটি শ্রেনি নিশ্চিতভাবেই অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকবে বা ভাল অবস্থানে থাকবে।

বণ্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কিত রলসের মতবাদটি সাম্প্রতিককালে একটি যুগান্তকারী মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। রলস উপযোগবাদী মতবাদকে বিশ্লেষণ করে একটি বিকল্প নৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মনে করেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান সদগুণ হলো ন্যায় এবং এর মুখ্য কাজ দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টনের সমতা নিশ্চিত হলে মানবাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা আয়, স্বাধীনতা ও সমতার নীতি মানবাধিকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। রলসের ন্যায়ের ধারণা স্বাধীনতা ও সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করেন, মুখ্য দ্রব্যসামগ্রী যেহেতু সীমিত, সেহেতু যোগ্যতা অনুযায়ী সেগুলো বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর মতে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজই যথার্থ সমাজ যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

জন রলস সামাজিক বৈষম্য বা অসমতাকে সামাজিক সংকটের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন এবং সামাজিক সংকট নিরসনে আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর চিন্তাতেই স্বাধীনতা, মানবিকতা ও মানবিক মুক্তির নৈতিকতার ধারণা নিহিতরয়েছে। রলস একজন উদারতাবাদী এবং তিনি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজে সংস্কারের মধ্যমে আয় এবং সম্পদের সমবণ্টনে বিশ্বাসী। রলস যে সমতার কথা বলেছেন তা নৈতিক সমতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে রলসের মতবাদ সামাজিক বা অর্থনৈতিক এবং নৈতিক দিক থেকে মানবাধিকারের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। অ্যান্ড্রু হেইড রলসসের ন্যায়বিচারের তত্ত্বকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদর্শনের ইংরেজি ভাষ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫২] মার্শাল কোহেন রলস এর তত্ত্বকে জন স্টুয়ার্ট

মিলের পর সংগঠিত রাষ্ট্রদর্শনের চেয়ে গভীর অবদান হিসেবে মনে করেন।[৫৩] রবার্ট নজিকের *Anarchy , State, Utopia (1974)* গ্রন্থে রলস-এর ন্যায়বিচারের ভাবনাকে আক্রমন করে বলেছেন, রাষ্ট্রের কাজ সম্পদের বণ্টন নয়, ব্যক্তির সম্পত্তিকে রক্ষা করা। রলসের সাম্যবাদী উদারনীতির পরিবর্তে তিনি পেশ করেন স্বাধীনতাবাদী উদারনীতি।

৪.৪ রবার্ট নজিকের অধিকার তত্ত্ব

রাষ্ট্রচিন্তার আধুনিক পর্বের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম রবার্ট নজিক। অ্যান্ড্রু হেইড নজিককে ধারাবাহিক স্বাধীনতাবাদী (Consistent Liberatarian) বলে গণ্য করেন।[৫৪] মুক্তবাজার তত্ত্বের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা এডাম স্মিথ ধ্রুপদী উদার অর্থনীতির যে দলিল পেশ করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তাকে আবার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফিরিয়ে এনেছেন নব্য উদারতাবাদী দক্ষিনপন্থী[৫৫] তাত্ত্বিক বলে পরিচিত একদল লেখক। মার্কিন পন্ডিত ও রাষ্ট্রদার্শনিক রবার্ট নজিক তার *Anarchy, State and Utopia* গ্রন্থে অ্যাডাম স্মিথ ও লক-এর তত্ত্বকে সামনে রেখে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে এবং ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। নজিক ব্যক্তির অধিকার সমুন্নত করতে যে বক্তব্য পেশ করেন তা জন রলসের এর মতো উদারতাবাদী ন্যয়তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

রবার্ট নজিক মনে করেন, রলস যে ন্যায়তত্ত্বকে পেশ করেছেন অর্থ্যাৎ ন্যায়বোধের কান্টীয় ভাবনাকে যুগের উপযোগী করে সাংবিধানিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মাধ্যমে বণ্টন ব্যবস্থাকে প্রচার করেন, ন্যায়ের অর্থ ঠিক তা নয়। তাঁর মতে, ন্যায় হলো মানুষের নিজস্ব মালিকানার অধিকারের মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দান, মানুষকে নিজের বিষয় নিজেকেই স্থির করার অধিকার দান। সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার ন্যায়সংগত। ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারসূত্রে বা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সম্পত্তি লাভ করে তবে সেই সম্পত্তির ওপরও তার অধিকার থাকবে। ব্যক্তি যদি এ অধিকার ন্যায়ভাবে ক্রয় করে বা তার হাতে এ অধিকার যদি ন্যায্যভাবে হস্তান্তরিত হয়, তবে এ অধিকারের বৈধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী বাড়াবাড়ি রকমের হস্তক্ষেপকে তিনি অন্যায় মনে করেন। তিনি চান 'অতি ক্ষুদ্র' রাষ্ট্র (minimal state)। ব্যক্তি ছাড়া আর কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সত্তায় তিনি বিশ্বাসী নন। ব্যক্তিজীবন বা ব্যক্তি ছাড়া আর কোনো সামাজিক অগ্রাধিকার থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতেই রাষ্ট্র থাকবে। রাষ্ট্রের কাজ হলো নানাভাবে অর্জিত ও প্রাপ্ত বৈধ সম্পত্তিকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র হবে সুরক্ষাদান সংস্থা (Protective Agency)। মানুষ নিজেই তার স্বাধীনতার কর্তা। মানুষের এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। রাষ্ট্র এই স্বাধীনতার ওপর বল প্রয়োগ বা এই স্বাধীনতার প্রতারণা থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখবে। রাষ্ট্রকে তিনি আরও স্পষ্টভাবে বলেন, dominant protective agency। অর্থাৎ ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য যা যা

দরকার–ব্যক্তিকে রক্ষা করা, রক্ষামূলক পরিসেবা দেওয়া, সুরক্ষার নীতিকে বলবৎ করা– এ কাজগুলো রাষ্ট্র করবে।

রাষ্ট্রের বৈধতা নজিক মেনে নিয়েছেন এই কারণে যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিকে ন্যায্য যা তা পেতে সাহায্য করবে, প্রাপ্ত ন্যায্য অধিকারকে রক্ষা করবে এবং অধিকারের লংঘনকারীদের শাস্তি দেবে। লকের মতো তিনিও বলেন, মানুষই রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিয়েছে। রাষ্ট্রের কাজ হলো তার সদস্যকে ক্রেতার মনস্তত্ত্ব দিয়েই বিচার করা। রাষ্ট্রের সদস্য ক্রেতার কাছে রাষ্ট্র একটি বৈধ সুরক্ষা সমিতির মতো। রাষ্ট্র যদি এই সুরক্ষা দিতে না পারে ক্রেতারূপী সদস্য অন্য সংস্থার দিকে ঝুঁকতে পারে- এই মনস্তত্ত্ব বিচার করেই রাষ্ট্র তার সদস্যদের চাহিদা ও দাবি সম্পর্কে সচেতন থাকবে। রাষ্ট্রের কাজ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই ক্রেতা সদস্যদের বিশ্বাস উৎপাদন করা ও নিজের বৈধতাকে প্রমাণ করা।

নজিক লকের এর চিন্তার সূত্র ধরেই বলেছেন, মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে যে অধিকার ভোগ করতো রাষ্ট্র অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে চায়। কিন্তু এ রাষ্ট্র হবস-এর *Leviathan*– এর মত নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান কখনোই হবে না, এমনকি লকের এর মতো সীমিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও নয়। নজিক চেয়েছেন এক মুক্তবাজার, যেখানে রাষ্ট্র হবে এক সুরক্ষা সমিতির মতো। মানুষ সুরক্ষা সমিতিরূপী এই রাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছে, কারণ অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নজিক রাষ্ট্রের কাছে সুরক্ষা পাওয়াটি মানুষের ভোগ্যবস্তু হিসেবেই দেখেন।

নজিক মনে করেন, প্রত্যকটি সমিতিই চায় তার ক্রেতা বা ভোক্তার স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে। কীভাবে বা কতটা সুরক্ষা এই সমিতিগুলো তার ভোক্তাকে দেবে এ নিয়ে সুরক্ষা সমিতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ে, আবার কখনো কখনো তাদের মধ্যে মধ্যস্ততার প্রশ্নে আগে থেকেই বোঝাপড়া হয়। এমনও দেখা যায় এ সব সংগঠনের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা মধ্যস্ততার ভাবনা পরিত্যাগ করে কোনো কোনো সংগঠন নিজের শক্তিতেই কোনো একটি এলাকা বা অঞ্চলে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ও বজায় রাখে। রাষ্ট্র এই সুরক্ষা সমিতির লক্ষণ নিয়েই ব্যক্তির কাছাকাছি আসতে চায়, কিন্তু তার অবস্থান ব্যক্তির থেকে অনেক দূরে। ব্যক্তি এর সদস্য হতে বাধ্য নয়। রাষ্ট্রও ব্যক্তিকে জোর করে এর সদস্য করবে না। রাষ্ট্র অন্যান্য সুরক্ষা সমিতিগুলোর মতোই ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিবে অথচ তার অধিকার হরণ করবে না। নজিক বলেন, রাষ্ট্র বা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা সমিতিগুলো ব্যক্তির অধিকার বলপূর্বক হরণ করলে ব্যক্তিকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নজিক যে 'Utopia'র সন্ধান দেন সেখানে

নৈরাজ্য নেই। রাষ্ট্র আছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার শক্তি হিসেবে নয়, সাহায্যকারী এক সুরক্ষা সমিতি হিসেবে। প্রকৃতির রাজ্যের স্বতস্ফূর্ততা, স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার অবস্থাকে নতুন যুগে অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছেন তিনি। নজিক ন্যূনতম রাষ্টের কথা বলেন এবং তা অতি ন্যূনতম (Ultra-minimal) যা সুরক্ষা দেবে, কিন্তু পীড়ন করবে না। নজিক এখানে যে রাজ্যের কথা, জগতের কথা ভাবেন সে জগৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষের জগৎ, যে মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে কিছু দেওয়া-নেওয়া করেনা বা কোনো অধিকার বণ্টন ব্যবস্থার শরিক নয়। নজিক-এর এই তত্ত্ব ন্যায়ের স্বত্বতত্ত্ব (entitlement theory of justice) হিসেবে পরিণতি লাভ করে।

নজিক যে 'Utopia' তুলে ধরেন তাতে মিলের মতো উন্নত মানবিক ব্যক্তিত্ব খোঁজেন। তিনি চেয়েছেন সেই রাজ্য গড়তে যেখানে মানুষ বিচিত্র জীবন-জীবিকা প্রণালীর সঙ্গে অভ্যস্ত, যেখানে মুক্ত মানুষের সৃজনশীল কল্পনাশক্তি প্রাধান্য পাবে। তিনি চেয়েছেন মানুষের তাৎক্ষনিক আবেগ বা অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হবে যা সঠিক জীবনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত (তার নিজের এবং অপরের জন্য) পথ অনুসরণ করা। মানুষকে এই জীবনে অভ্যস্ত হবার জন্য সামর্থ অর্জন করে যেতে হবে। তবে কীভাবে সে এই সামর্থ অর্জন করবে তা তিনি স্পষ্ট করেননি। তিনি নিজেই হিতবাদী সুখের ধারণা ছেড়ে অর্থপূর্ণ জীবনের কথা বলেন কিন্তু এই অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান কীভাবে সম্ভব তার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। ভোগবাদী সমাজে, অদৃশ্য বাজার দ্বারা পরিচালিত সমাজে ভালো মানুষ গড়ার স্বপ্ন কতটা বাস্তবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

রবার্ট নজিকের তত্ত্বে ধ্রুপদী উদার ধারার পূনর্বাসন ঘটেছে একথা বলা হলেও তিনি যে লক বা মিল এর ঐতিহ্যকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন তা বলা যায় না। হায়েক ছাড়া তাঁর ন্যুনতম রাষ্ট্রের ভাবনা বৌদ্ধিক মহলে বিরাট সাড়া ফেলেছিল তা নয়। তাঁর ইউরোপিয়ান দৃষ্টি উদারতাবাদীদের অন্যান্য ধারাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

ড. অমর্ত্য সেন, রবার্ট নজিকের তত্ত্বকে স্বাধীনতাচেতা তত্ত্বের আরো সরল সংস্করণ বলেন। নজিকের সাধারণ যুক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ ব্যতিক্রমের ধারণা (যাকে তিনি সর্বনাশী নৈতিক বিভীষিকা বলেছেন) ঠিক মেলেনা। ড. সেন এর মতে, স্বাধীনচেতার অধিকারকে বিনাশর্তে অগ্রাধিকার প্রদান করা সমস্যাসংকুল, কারণ স্বত্ত্বাধিকারগুলোর প্রচলন বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করতে পারে। মৃত্যুর সম্ভাবনা পরিহার, ভালো পুষ্টি ও স্বাস্থ্য লাভ, স্বাক্ষরতা-এসব বাস্তব স্বাধীনতা এর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।[৫৬]

তথ্য নির্দেশ

১. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইমানুয়েল কান্ট প্রকৃতিবাদী নৈতিকতা ও মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক নৈতিকতার বিরোধিতা করে বিশুদ্ধ বুদ্ধির ওপর নৈতিকতাকে দাঁড় করান। তিনি মানুষকে উপায় বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দেন। 'মানুষ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, কখনোই উপায় নয়' কান্ট এই যুক্তির মাধ্যমে উদারনৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন। দ্রষ্টব্যঃ Galvano Della Volpe, *Roussean and Marx*, (London: Lawrence and Wishart, 1987), p.78.

২. I. Kant, *Critique of Pure Reason*, Trans, J.M.D. Mieklejohn, (London: Everyman's Library.1943), p.25-26 & 30-32.

৩. শেখ আবদুল ওয়াহাব, *কান্টের নীতিদর্শন*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২), পৃ.১৩৬-১৩৭.

৪. শেখ আবদুল ওয়াহাব, *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬), পৃ. ১.

৫. D.D. Raphael, *Problems of Political Philosophy*, (London: Macmillan and Co., Ltd. 1970), p.165.

৬. J. Hospers, *Human Conduct*, (New York: Harcourt, Brace World, Inc. 1961), p. 416.

৭. I. Kant, *Lectures on Ethics*, (Cambridge University Press, U K, 2015), p.42.

৮. *Ibid*. p. 44.

৯. G. J. Warnock, *Contemporary Moral Philosophy* (London: Macmillan Co. Ltd., 1967), p. 55- 61.

১০. কর্তব্যবাদী কান্টপন্থীরা মানব মঙ্গলকে নৈতিক বিষয় বলে মনে করেন না। অপরদিকে, কুর্ট বেয়ার, কাই নীলসন, মানব মঙ্গলকে নৈতিকতার প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করেন।

১১. দেখুন, W. K. Frankena, *Ethics*, PP. 113, 114 এবং শেখ আবদুল ওয়াহব, *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬), পৃ, ৩৮৮-৩৮৯.

১২. Kurt Baier, "Why Should We Be Moral?", *Choice and Action*, Charles L. Reid (ed), (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1981), p.20.

১৩. John Rawls, "*Ethics and Social Justice*", *Great Traditions in Ethics,* 5th ed., Ethel M. Albert et. Al. (eds.), (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), p.367.

১৪. Charles L. Reid, "*Ethics, Society and Individuals*", *Choice and Action*, p. 14.

১৫. Hudson, W. D., *Modern Moral Philosophy*, (London: The Macmillan Press Ltd, 1981), p.278.

১৬. D. Henry, Aiken (ed) *Hume's Moral and Political Philosophy*, (New York: Hafner Publishing Company, 1984), p. 185.

১৭. Hayek, F, The Constitution of Liberty (Routledge and Kegan Paul, 1960), p, 63.

১৮. *প্লেটোর রিপাবলিক*, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮), পৃ. ২০৬.

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩.

২০. R. H. S. Crossman, *Plato Today*, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1963), p. 84.

২১. F. M. Volkov (eds), *Ethics*, (Moscow: Progress Publishers, 1989), P.11.

২২. *প্লেটোর রিপাবলিক*, পৃ. ২২৪.

২৩. *এরিস্টটলের পলিটিকস*, অনুবাদ, সরদার ফজলুল করিম, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩), পৃ. ১৩.

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪.

২৫. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Trans, Trence Irwing, (Indiana: Hackett Publishing Company Inc. 1985), p. 119.

২৬. *Ibid*, p. 118.

২৭. *এরিস্টটলের পলিটিকস*, অনুবাদ, সরদার ফজলুল করিম, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৩), পৃ. ১৩৪.

২৮. I. Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*, (Trans.) T. K. Abbott , London;Longmans,1962, p.39.

২৯. Galvano Della Volpe, *Rousseau and Marx*, (London: Lawrence and Wishart, 1987), p. 78.

৩০. *কান্টের নীতিদর্শন*, শেখ আবদুল ওয়াহাব অনূদিত, পৃ. ২২০.

৩১. G. W. F. Hegel, *The Philosophy of History*, (Chicago: William Benton Publisher, Encyclopaedia Britannica, 1952), Vol. 46, p. 156-157.

৩২. G. W. F. Hegel, *The Philosophy of Right*, Trans, T. M. Knox, (Chicago: William Benton Publisher, Encyclopaedia Britannica, 1952), Vol. 46, p. 9 .

৩৩. *Ibid*, p. 23.

৩৪. *Ibid*, p. 80.

৩৫. Marcuse, H., *Reason and Revolution*, 2nd ed. (London: Routledge & Kegan Paul, 1986), p. 189.

৩৬. কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড- ১, অংশ-১ (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮), পৃ. ৮৫১.

৩৭. জন রলস ন্যায়পরতার প্রসঙ্গটিকে কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করেন। তিনি ন্যায়পরতার ধারণাকে সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষার বিষয় হিসেবে দেখেন। ন্যায়পরতার প্রসঙ্গটির সাথে সমাজে বসবাসকারীদের সম্পর্কের বিষয়টি চলে আসে। দেখুন, John Rawls, "Ethics and Social Justice" *Great Traditions in Ethics*, 5th ed., Ethel M. Albert et al (eds) (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), p.367.

৩৮. Rawls: "Distributive Justice" in Peter Laslett and W.G. Runciman (ed.) *Philosophy, Politics and Society* (III Series) (Oxford, 1967), p.61।

৩৯. Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), p.78.

৪০. *Idid*., p.80.

৪১. *Ibid*., p. 79.

৪২. *Ibid.*, p. 75.

৪৩. T. Campbell, *Justice*, p. 75.

৪৪. *Ibid*., p. 81.

৪৫. উপযোগবাদ অনুযায়ী, যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণে সুখ উৎপাদনে উপযোগী সে কাজ ভালো, আর যে কাজ তদুপযোগী নয় সে কাজ মন্দ। এই মতবাদ অনুসারে কাজের উপযোগিতা বিচার করে তার নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। উপযোগবাদী নীতি অনুযায়ী, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই মানুষের নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিৎ।

৪৬. কান্ট সর্বজনীন নীতির (Universal principale) কথা বলেন, সর্বজনীনতার নীতির ভিত্তিতে তিনি কর্মনীতিকে বিচার করার কথা বলেন। কান্টের কাছে তা ছিল ব্যক্তির মৌলিক নীতিবোধ, তিনি নৈতিকতার শর্ত হিসেবে সর্বজনীনতা, আত্মসংহতি ও নৈতিক আত্মজিজ্ঞাসার কথা বলেন।

৪৭. J.W. Gough, *The Social Contract*, 2nd ed (Oxford: Clarendon Press, 1957), p.40.

৪৮. John Rawls, "A Theory of Justice", Aeon j. Skoble & Tibor. R. Machan, *Political Philosophy Essential Selections*, (Delhi: Pearson Education, 2007), p. 453.

৪৯. T. Campbell, *Justice*, p. 78.

৫০. *Ibid.,* p.75.

৫১. *Ibid.,* p.80.

৫২. Andrew, Heywood, *Politics* (Palgrave foundations, Macmillan, 2004, p.58.

৫৩. Marshall Cohen, in *The New York Times Book Review*, July 16.1972, in Bluhm, *Classical Political Thought* (Prentice Hall of India 1981). p.379.

৫৪. Heywood, A., *Political Ideologies* (Palgrave, Macmillan, 2003), p. 97.

৫৫. এদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা ফ্রেডেরিক হায়েক, মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যান, জন রলস, রবার্ট নজিক, ইশাইয়া বার্লিন।

৫৬. অমর্ত্য সেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা*, অনুবাদ, অরবিন্দ রায়, (আনন্দ, ২০০২) পৃ.৭৩.

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার

৫.১ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি বুঝতে হলে এখনকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"। লক্ষ্যনীয় যে, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রায় সকল অনুচ্ছেদই বাংলাদেশের সংবিধানে বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায়, ২০১২-২০১৪ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে কিছু অগ্রগতি সাধন করেছে। তথাপি, দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না, আগের বছরগুলোর মতোই বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড, জেল-হাজত বা পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, নির্যাতন, বিচার ছাড়া আটক রাখার ঘটনা এবং জোরপূর্বক অন্তর্ধানের ঘটনাও অব্যাহত ছিল।

২০১২ সালে নির্বাহী সিদ্ধান্ত ও বিচার বিভাগীয় নির্দেশনার ভিত্তিতে কিছু ইতিবাচক নীতি প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক কিছু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২, পর্ণোগ্রাফি নিসিদ্ধ আইন ২০১২, পারিবারিক নির্যাতন ও সুরক্ষা আইন ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ প্রণয়ন।

২০১৩ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি সর্ম্পকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর পর্যালোচনায় দেখা যায়, মানবাধিকারের প্রধান দুই ভাগের একটিতে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হরেছে। এ বছরে ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ

এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালো অবস্থানে রয়েছে বলে বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রভাবশালী গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি)[১] বিশ্বের ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২০১৩ সালে এই সূচকে ১১ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। একই সময়ে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা [২](এফ এ ও) তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বৈশ্বিক অবস্থা নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। এছাড়া শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যুর হার ও দারিদ্র হ্রাস পাওয়াসহ মানব উন্নয়ন সূচকের অনেকগুলো অর্জন বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত করেছে। অন্যদিকে মানবাধিকারের আরেকটি সূচক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও এ ক্ষেত্রেও কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সরকার কর্তৃক দেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশু আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, পিতামাতার ভরণ পোষণ আইন-২০১৩, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন - ২০১৩, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অধিবাসী আইন-২০১৩, জাতীয় নদী রক্ষা আইন-২০১৩ প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য।

এতদসত্বেও ২০১৩ সালে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল চরম উদ্বেগজনক। বছরব্যাপী ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে রাজনৈতিক সহিংসতা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধের বিচারের রায় ও জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী বিভিন্ন সহিংস কর্মকান্ড ও নাশকতার ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে বাস-ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহনে ব্যাপকহারে আগুন লাগানো ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপে সাধারণ মানুষের প্রানহানি এবং রেল, পুলিশ ফাঁড়ি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর আক্রমণ, বেধড়ক মারপিট, কখনও অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। অপরদিকে বিরোধী দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে গ্রেফতার, আটক ও গুলো বর্ষণসহ অতিমাত্রায় বল প্রয়োগের ঘটনায় অনেক প্রাণহানি হয়। দেশে গুম ও গুপ্তহত্যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নতুন সংযোজন।

দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ উল্লেখ করে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল বলেছেন, "২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াবহতোর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দেশে খুন,

গুম বন্ধ হয়নি। ক্রসফায়ারের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় এবার প্রায় দ্বিগুণ, বড় দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচনের পর অপহরণ করে খুনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইন পাসের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তল্লাশির নামে বিভিন্ন গণমাধ্যম অফিসে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঢুকে গণমাধ্যম কর্মীদের হয়রানি করার ঘটনাও ঘটেছে।

৫.২ আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি

আদিবাসী কারা? জাতিসংঘের সাধারণ সভার ঘোষণানুযায়ী যারা বংশ পরম্পরায় একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে তারাই আদিবাসী। এসব আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে বহু বিচিত্র জীবনাচার, ভাষা, কৃষি পদ্ধতি, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস। তারা গোটা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যালঘুর মধ্যেও সংখ্যালঘু। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থানে তারা দরিদ্রের মধ্যে আরো দরিদ্র।[৩]

বিশ্বব্যাংকের নীতিমালায় যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারায় দুর্ভোগের কবলে পড়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির ওপর তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার সামর্থ্য রাখতে পারে না, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সুফল নেয়ার সামর্থ থাকেনা এমন সব দুর্বল জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের বিবেচনায়, যারা নিজেদের আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দিতে চায়, যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান রাষ্ট্রের সংখ্যাধিক্য অংশ থেকে পৃথক এবং যাদের সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে নিজেদের রীতিনীতি বা প্রথা অথবা বিশেষ আইন অথবা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তারাই আদিবাসী। তারা এমন জনগোষ্ঠী, যারা নির্দিষ্ট এলাকা বা ভূখন্ডে বিজয়াভিযান, উপনিবেশকরণ অথবা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা প্রতিষ্ঠাকরণের আগে থেকেই বসবাস করে আসছে এবং যাদের আইনগত মর্যাদা যাই হোক না কেন নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে রেখেছে।

বাংলাদেশের আদিবাসী নেতা পৌল চারোয়া তিগ্যার মতে, ভারতবর্ষে যে মানুষদের প্রথম পাওয়া গিয়েছিল তারাই আদিবাসী, এদের জীবন যাত্রা সহজ-সরল, তারা জটিল প্রযুক্তি ব্যবহার করে না, এদের ভাষায় বর্ণমালা নেই।[৪] আদিবাসী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো - এরা আদিম অথবা জংলী এবং নরমুন্ডশিকারী, এরা পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেনা, এদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিম্নস্তরের। এরা স্থায়ী আবাসহীন, ভবঘুরে ও অনুপ্রবেশকারী। এসব কারণে তারা বাংলাদেশের কেউ না।[৫]

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সন থেকে আজ পর্যন্ত আদিবাসী ও উপজাতি অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে এমন বেশ কয়েকটি জাতিসংঘের দলিলে স্বাক্ষর করলেও আজও নীতিনির্ধারক গোষ্ঠী আদিবাসী অধিকার বিষয়ে অত্যন্ত নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার বাঙালি মুসলমানদের পার্বত্য চট্রগ্রামে বসবাস অনুমোদন করে যা আদিবাসীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে ষাটের দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে। এদেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ বাঁধ নির্মাণ করা হলেও পার্বত্য চট্রগ্রামের ৪০ শতাংশ আবাদি জমি প্লাবিত হয় এবং জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশকে স্থানচ্যুত করা হয়। চল্লিশ হাজারের মতো পরিবেশগত শরনার্থী ভারতের উদ্দেশ্য দেশত্যাগ করে যারা এখন অরুনাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাস করে। তারা ভারতের নাগরিক নয়, (যেহেতু কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে) আবার বাংলাদেশেরও নয়, ফলে কোনরকম অধিকারন তাদের নেই।[৬]

স্বাধীনতার পর আদিবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্রগ্রামের স্বায়ত্বশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের নতুন সরকার এ আবেদনকে মনে করে বিচ্ছিন্নতাবাদ। এ ধারণার ভিত্তিতে সরকার ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্রগ্রামে সামরিক অভিযান চালায়। ফলে হাজার হাজার মারমা ও ত্রিপুরা ভারতে পালিয়ে যায়। সরকারি বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য গঠিত হয় জনসংহতি সমিতি এবং সামরিক শাখা-শান্তি বাহিনী।

বিশ্বজুড়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি এবং শিল্প কারখানার প্রসারের ফলে অনেক দেশের আদিবাসীদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষিপদ্ধতি ক্রমাগত বিপন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯৪ সালের ৯ আগস্টকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। একই বছর ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ১৮৫ টি সদস্য রাষ্ট্র ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ সালকে আদিবাসীদের পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চয়তার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'বিশ্ব আদিবাসী দশক' ঘোষণা করে।[৭] এ দশকের শ্লোগান হলো - আদিবাসী জনগণ: কর্ম-জীবনের সঙ্গী। বিশ্ব আদিবাসী দশকে আদিবাসীদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে ইউনেস্কো, স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা এবং পরিবেশের সচেতনতার জন্য বিশ্বখাদ্য ও কৃষিসংস্থা।

আদিবাসী দশকের বেলায় আশা করা হয়েছিল যে, আদিবাসী জনগণ এবং বিশ্বের সরকারসমূহ ও অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ পক্ষের মধ্যে আদিবাসী অধিকার সংরক্ষণ ও আদিবাসীদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বলেন, আদিবাসী মানুষের বেঁচে থাকা বিপদ এবং তাদের বিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা এখনো বিলুপ্তির শংকামুক্ত নয়। তিনি বলেন, আদিবাসীদের অধিকার ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ সকল দেশের মানুষের মনোযোগের দাবি রাখে।[৮]

আদিবাসী দশকের বাস্তবায়িত দুটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি হলো আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের ব্যাপারে জাতিসংঘকে প্রতিবেদন পেশের জন্য "বিশেষ প্রতিবেদন" নিয়োগ করা। দশকের জন্য অর্জিত লক্ষমাত্রা হলো জাতিসংঘের ব্যবস্থার অধীনে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম স্থাপন করা। এই ফোরামের প্রতিষ্ঠা ও জাতিসংঘ পদ্ধতিতে ফোরামের অবস্থান একটি অভিনব ঘটনা। এই ফোরামটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে অন্যতম হলো জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করা এবং এই পরিষদ ও জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থামূহকে (যেমন- ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, ফাও ইত্যাদি) আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়ের পরামর্শ প্রদান করা। দশকের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘ কর্তৃক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারের ওপর একটি সনদপত্র গ্রহণ করা, যা এখনো সম্ভব হয়নি।

১৯৮৫ সালে নাইরোবির প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন সংখ্যালঘু নারীদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছিল। এই সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়, আদিবাসী নারী সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে যে বঞ্চনা, নিষ্পেষনের মধ্যে থাকতে হয় তাতে নারী হিসেবে তারা দ্বৈতভাবে অবহেলিত। সেখানে তাদের সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংখ্যালঘু নারী সমস্ত মানবাধিকারের সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা দাবি করে। কেননা সংখ্যালঘু নারী পরিণত হয় এক বাকশক্তিহীন শ্রেণিতে। এ বৈষম্য যেমন আসে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে, তেমনি আসে তার নিজ সমাজ থেকে।[৯]

আদিবাসীদের অধিকারও সর্বজনীন মানবাধিকার। অন্য সবার মতো মানবাধিকার আদিবাসীদের জন্মগত অধিকার। আদিবাসী মানুষ যখন তার ভূমির অধিকারের কথা বলে, সেটি তার মানবাধিকার। একজন আদিবাসী যখন তার নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করে, সেটি তার মানবাধিকার। আদিবাসীদের রয়েছে

আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার। নিজের পরিচয়, ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারা নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার তাঁর রয়েছে। এমকি উন্নয়নের অধিকারও আদিবাসীদের মানবাধিকার।

দিন দিন আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। আদিবাসী জণগণের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, ভূমি বেদখল, ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদের হুমকি, আদিবাসী নারী নির্যাতন, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, আদিবাসী ভূমিতে জোরপূর্বক বনায়ন কর্মসূচি, ইকো-ট্যুরিজম বেড়েই চলছে। অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের হত্যো করা হয়েছে। আদিবাসীদের গ্রাম সদলবলে আক্রমণ করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে, ২৩ জুলাই ২০১৫, নওগাঁর নিয়ামতপুরে আদিবাসী গ্রামে সংগঠিত ঘটনাটি অবলোকন করে বুঝতে পারি কিভাবে প্রতিনিয়ত আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন, ভূমি জবরদখল ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে থাকে।

২৩ জুলাই ২০১৫ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮ ঘটিকায় শরিফুলের নেতৃত্বে ১২ থেকে ১৪ জন নাকইল গ্রামে গিয়ে দু'দিনের মধ্যে পূর্বপুরুষের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে ওঠে যাওয়ার জন্য আদিবাসীদের হুমকি দেয়। পরবর্তীতে ২৫ জুলাই সকাল ৬টার সময় শরিফুলসহ ৩-৪ জন নাকইল গ্রামে উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ৫০-৬০ জন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এমন সময় শরিফুলের সাথে বিশ্বনাথের কথা কাটাকাটি শুরু হলে একপর্যায়ে সে তার হাতে থাকা বল্লম দিয়ে লবিনকে আঘাত করলে লবিন গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আর তার লাঠিয়াল বাহিনীরা এলোপাথাড়িভাবে উপস্থিত আদিবাসীদের মারধর করতে থাকে। অস্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহার করে লাঠি, কোদাল, চাইনিজ কুড়াল, হাসুয়া, ছুরি ইত্যাদি। তাদের এলোপাথাড়ি মারধরের মুখে লোকজন জীবন বাঁচানোর তাগিদে যে যেদিক পারে পালিয়ে যায়। লোকজন পালানোর সময় হামলাকারীরা বিশ্বনাথকে ধরে ফেলে এবং তাকে বাঁশের সাথে বেঁধে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে। এতে তার হাঁটুর নিচে ভেঙ্গে যায়। লক্ষ্মীরাম বিশ্বনাথকে বাঁচাতে এলে হামলাকারীরা তাকেও গুরুতর জখম করে। একপর্যায়ে তারা বিশ্বনাথকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলে বিশ্বনাথ তাদের কাছে বলে, আমাকে মেরো না, আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এরপর হামলাকারীরা তাকে ছেড়ে দেয় এবং বলে, এখনই গ্রাম না ছাড়লে খুন করে ফেলবো। এরপর শরিফুলের লাঠিয়াল বাহিনী শুরু করে বাড়ী-ঘর ভাংচুর ও লুটপাট। তার সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই মেরেছে, এমনকি বিশ্বনাথের ৪ বছরের ছেলেও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তারা তাকে মেরে আধমরা করে ধানক্ষতে ফেলে দেয়, নারীদের শ্লীলতাহানি করে বের করে দেয় এবং রুবেন ও নির্মলকে বল্লব দিয়ে খুচিয়ে আহত করে।[১০] এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীরা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

৫.৩ আদিবাসীদের মানবাধিকার : দার্শনিক বিশ্লেষণ

আদিবাসী জীবনে শোষণ ও বঞ্চনা নিয়ত। ঐতিহাসিকভাবে আদিবাসীরা বৈষম্যের শিকার। আধুনিক রাষ্ট্র আদিবাসী ওয়ার্ল্ডভিউ বুঝতে অক্ষম বলেই জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আদিবাসীদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্বের আবেদন জানিয়েছে। আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রথম আদিবাসী দশক ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে, বেসরকারী সংগঠন ও অন্যান্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। আদিবাসী ইস্যুতে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় দশকের অন্যতম লক্ষ্য ছিল আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন। এসবের কোনটিই কি বাস্তবে আমরা দেখতে পাই? তাই আদিবাসীদের জীবন ভাবনার বিশ্বজনীনতাকে বুঝতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ৬ জনুয়ারী ১৯৪১ সলে তাঁর বিখ্যাত ফোর ফ্রিডম স্পিচ[১১]- এ যে চারটি স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, তাঁর মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'ভয় থেকে মুক্তি'। ভয় থেকে মুক্তি বলতে তিনি যে কোনো প্রকার হানাহানি এবং সহিংসতা ব্যতিরেকে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপনকে বুঝিয়েছেন। ভাষণে চারটি অধিকার- মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করা বা না করার স্বাধীনতা, দারিদ্র বা মানবেতর জীবন-যাপন থেকে মুক্তি এবং ভয় থেকে মুক্তির কথা তিনি বলেছিলেন, তা আজও আমাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দেয়া ভাষণের এ অধিকারগুলো শুধু ভাষণে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনাপত্রে স্থান করে নিয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারা-৩ বলছে, 'প্রত্যেকের জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে'। আমাদের দেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী, "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। প্রত্যেকটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে এই অধিকারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

আদিবাসীদের অধিকারের ধারণাকে যদি ব্রিটিশ দার্শনিক টমাস হবসের স্বাভাবিক অধিকারের বিবেচনায় চিন্তা করা যেতে পারে। হবস তার *লেভিয়েথান* গ্রন্থে স্বাভাবিক অধিকার বলতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা অনুসারে যা খুশি করার অবাধ স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। তিনি দেখান, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের স্বাধীনতা ছিল, সমতা ছিল কিন্তু এ স্বাধীনতা ও সমতা যুক্তির দ্বারা পরিচালিত নয়, পরিচালিত হতো প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী অর্থাৎ এ স্বাধীনতা ও সমতা প্রাকৃতিক

স্বাধীনতা ও সমতা। ফলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস, ভীতির আবেগ কাজ করতো। আর তাই নিরাপত্তাহীনতার কারণে আত্মনির্ভরতার অভাব এই পরিবেশ থেকে জন্ম নিয়েছে। হবসের তত্ত্ব অনুযায়ী বিচার করলে দেখা যায় আদিবাসীদেরও প্রকৃতির রাজ্যের মতো স্বাধীনতা ও সমতা ছিল, যে স্বাধীনতা ও সমতা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপমুক্ত। তবে তারা যে স্বাধীনতাটুকু ভোগ করে তা তাদের পরিবার, গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ। ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই পরিসরে সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে কিন্তু বৃহৎ পরিসরে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বলতে যা বোঝায় প্রকৃতির রাজ্যের মতো তাদেরও নেই। অবাধ স্বাধীনতার পরিবর্তে সুশৃঙ্খল স্বাধীনতার অধিকার নেই। কেননা, প্রকৃতির রাজ্যের পাশবিক, বর্বর, নিঃস্ব এবং নিঃসঙ্গ জীবনে প্রকৃত সুখ স্বাধীনতা থাকতে পারেনা। অপরকে হত্যা করে, অপরের সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ বা বিদ্বেষভাবাপন্ন জীবনযাপন করে, ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না।

হবসের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই, স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করত মানুষ। মানুষ ছিল হিংস্র ও স্বার্থপর। প্রকৃতিগতভাবেই সে পেয়েছে যুদ্ধের, অন্যকে আক্রমণ করার, অন্যের অধিকার কেড়ে নেবার শক্তি। হবস্‌ের এর চিন্তায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় সম্পত্তি বা মালিকানার ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য ছিল না বলেই মানুষের মধ্যে আমি বা তুমি বোধ ছিল না, ফলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ছিল স্বাভাবিক। এ রাজ্যে আইন ছিলনা সুতরাং অন্যায় বলেও কিছু ছিল না। মানুষের পারস্পরিক কলহ এবং যুদ্ধেও তাই ছিল না অন্যায়বোধ। হবসের কথায় এ রকম পরিবেশে এমন কেনো সাধারণ ক্ষমতা বা শক্তি নেই যা মানুষকে দিতে পারে নিরাপত্তার, সুস্থ আতঙ্কহীন জীবনের আশ্বাস।

প্রকৃতির রাজ্যে এ যুদ্ধের অবস্থাটি যে অন্যায় নয়, এ অনিশ্চিত পরিবেশ যে অস্বাভাবিক নয়, বরং এটাই স্বাভাবিক এ কথা হবস্‌ স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এ অবস্থা যে অভিপ্রেত নয়, এ অবস্থা অতিক্রম করে এক সুনিশ্চিত, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের লক্ষ্যে মানুষকে অগ্রসর হতে হবে এবং আইনের পথেই শৃঙ্খলার দন্ড নিয়ে যে আবির্ভুত হবে নতুন এক সমাজ (যাকে হবস বলেছেন, পৌর সমাজ বা রাষ্ট্রীয় সমাজ) সেই আশাই হবস ব্যক্ত করেছেন তাঁর *Leviathan*- এ।

হবসের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, বিরামহীন যুদ্ধের অবস্থা থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্যে পৌঁছবার লক্ষ্যেই পারস্পরিক চুক্তি করে মানুষ তার ক্ষমতা তুলে দেয় যে কর্তৃপক্ষের হাতে এবং যার

আনুগত্য স্বীকারে আগ্রহী হয় সেই কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম। সার্বভৌমই মানুষকে ভয়াবহ আদিম অবস্থা থেকে পরিত্রান লাভ করে সভ্য জীবনযাপনের পথে পরিচালিত করার নিয়ম ও ব্যবস্থা গড়ে দেয়। সার্বভৌম শক্তির উদ্ভব যখন হয়নি, সেই আদিম অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক আধিকার ছিল অর্থাৎ মানুষের যথেচ্ছারিতার স্বাধীনতা ছিল কিন্তু ছিল না স্বাভাবিক আইন, যে আইন তাকে এই যথেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত রাখে। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সৃষ্টি হলো এই স্বাভাবিক আইন যা নৈরাজ্য থেকে, পারস্পরিক বৈরিতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে দিল প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত সমাজ জীবনের সন্ধান। সার্বভৌম যে শুধু স্বাভাবিক আইনের স্রষ্টা বা এই আইনের রক্ষক তাই নয়, হবসের মতে, সার্বভৌম নৈতিকতার প্রবর্তক। প্রকৃতির রাজ্যে যথেচ্ছাচারিতা ছিল বলে ন্যায়-অন্যায়বোধ ছিলনা। রাষ্ট্রীক সমাজ, সার্বভৌম শাসন কর্তৃপক্ষ মানুষকে দিল নৈতিকতার শিক্ষা।

এভাবে হবস দেখান যে, নিরাপত্তা ও সুনিশ্চিত জীবন যাপনের লক্ষ্যে পারস্পরিক সম্মতি ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে নিজেদের অধিকার একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে অর্পণ করে। ফলে আমরা দেখি কীভাবে ব্যক্তি স্বাভাবিক অধিকার থেকে রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকারে পদার্পণ করে।

হবসের তত্ত্ব অনুযায়ী আদিবাসীদের অধিকার ভোগের বিষয়টি দুটি পর্যায়ে বিবেচনায় রেখে বিশ্লেষণ করতে পারি। প্রথমত, প্রকৃতির রাজ্যে বা রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির পূর্ব পর্যায়ে; দ্বিতীয়ত, আইনের রাজ্যে বা রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির পর্যায়ে।

প্রথম ক্ষেত্রে, আদিবাসীরা জাতিগত মর্যাদা, ভূমির মালিকানার স্বাধীনতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনের স্বাধীনতা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা পদ্ধতি তাদের সমাজের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ও স্বীকৃত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিসরে তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের বিষয়টি অনেকটা অনিশ্চিত। নাগরিক জীবন বা চুক্তিভিত্তিক জীবন এই প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত করে আইন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে আদিবাসীদের স্বাধীনতা ও অধিকার লাভের অনুকূল পরিবেশ গড়ে দিতে পারে। আবার, হবস্ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষেও মত প্রকাশ করেছেন। আদিবাসীদের সম্পত্তির ওপর দখলাধিকার থাকলেও সম্পত্তির অধিকার নিরাপদ ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পত্তির জবরদখল এই অধিকারকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে। এক্ষেত্রে তারা চুক্তি করে সার্বভৌমকে সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। আদিবাসীদের

সম্পত্তি ভোগ ক্রয়-বিক্রয়ের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনেই এ অধিকারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন। সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করার স্বার্থেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় বা নাগরিক জীবনে পদার্পণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইনি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। অধিকার লঙ্ঘনের পরিবর্তে অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

আদিবাসীদের বিশেষ করে পার্বত্য চট্রগ্রামে রাজনৈতিক অধিকার আংশিক সংরক্ষিত হলেও সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকায় পার্বত্য চট্রগ্রামে চুক্তি বাস্তবায়নে আইনগত সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে সমতলের আদিবাসী জাতিগুলোর আইনি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তাই আদিবাসী জাতিগুলো প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। যেমন:

১. **আদিবাসীদের আত্মপরিচয়:** আত্মপরিচয়ের আধিকার মানবাধিকার। আদিবাসীরা নিজেদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। কিন্তু সংবিধান সংশোধনসহ যেসব আইন প্রণয়ন করেছে যেসব ক্ষেত্রে 'আদিবাসী'র পরিবর্তে 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর ও মর্যাদাহানিকর শব্দ ব্যবহার করেছে। 'উপজাতি' শব্দটি অপমানসূচক আর 'নৃগোষ্ঠী' শব্দটি জাতি অর্থে বুঝানো হয় না; বরং মানুষের গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়ে থাকে। সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'বাংলাদেশে'র জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি'; সেদিক থেকে এদেশের আদিবাসীরাও বাঙালি বলে বিবেচিত। এ বাক্যটির মধ্য দিয়ে সরকার আদিবাসীদের ওপর বাঙালি জাতির পরিচয়টি চাপিয়ে দিয়েছে। আবার সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে জাতিগত স্বীকৃতির প্রশ্নে আদিবাসীরা সমান অধিকার পায়নি। এটি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২. **ভূমির মালিকানা ও অধিকার:** আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত আইএলও কনভেশন নং ১০৭ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে অনুস্বাক্ষর করে এবং এই সনদের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ঐতিহ্যগত ভূমির মালিকানা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। আইএলও কনভেশনের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির ওপর যৌথ কিংবা

ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে'।[১২] কিন্তু আর্ন্তজাতিক সনদের বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং এসবের আলোকে আইন না থাকায় আদিবাসীরা তাদের ভূমি রক্ষা করতে পারছে না। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা নিয়মিতভাবেই সমতলের আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটামাটি থেকে উৎখাত করছে। জাল দলিল ও বল প্রয়োগসহ নানাবিধ কৌশলে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের জমি দখল করছে, আর সরকার দখল করছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে। ভূমিই আদিবাসীদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। ভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার মধ্য দিয়ে এভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হতে থাকে।

৩. **হামলা, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলাঃ** আদিবাসীদের বাড়ী-ঘরে অগ্নিসংযোগ, হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিবাসীরা আক্রমণ প্রতিহতো করতে এলে তাদের ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ী-ঘরের সম্মুখ থেকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় এবং সারারাত আটক রেখে পরদিন তাদের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানোর মাধ্যমে হয়রানি করে। আবার অনেক আদিবাসীদেরই নানা আইনের ফাঁকফোকরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আর একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। আদিবাসী মানুষের অধিকার যে মানবাধিকার, এই প্রকৃত সত্য এখনো রাষ্ট্র ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি।

৪. **ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারঃ** জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণা পত্র ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ঘোষণাপত্রের ৩ নং ধারায় বলা আছে, 'আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রহৈর অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের বলে তারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংকৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে'। এছাড়াও আদিবাসীদের নাগরিকত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, অধিকারের সমতা, মর্যাদা, আদিবাসী নারী, শিশু ও প্রবীনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চাকুরি, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্রে স্থান পেয়েছে। আবার সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। কিন্তু আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার অস্তিত্ব হুমকির মুখে। 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' উদযাপনে বাধা প্রদান এবং এই দিবস উপলক্ষে কাউকে সহযোগিতা না করার জন্য অফিস আদেশ প্রদান এক ধরনের মানবাধিকারকে অস্বীকারের শামিল। আদিবাসী শিশুদের নিজেদের মাতৃভাষায় পড়ালেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

পর্যাপ্ত স্কুল না থাকায় আদিবাসী শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। এভাবে তারা শিক্ষা-সংস্কৃতির, উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৫. **আদিবাসী নারীর মানবাধিকার অবস্থা:** পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি পার্বত্য চট্রগ্রামের নারীদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও উন্নয়নে অংশগ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে নারীরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ওপরন্তু নারীরা নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয়। আদিবাসী নারীরা বহুমাত্রিক শোষন ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তারা অন্তত পাঁচটি স্তরে বৈষম্যের শিকার হয়। প্রথমত, আদিবাসী হিসেবে; দ্বিতীয়ত, আদিবাসী নারী হিসেবে; তৃতীয়ত, অতি দরিদ্র হিসেবে; চতুর্থত, দূরে পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী হিসেবে এবং পঞ্চমত, অভিবাসী নারী হিসেবে বা মাইগ্রেটেড নারী হিসেবে কাজের সন্ধানে শহরে এসে। কাপেং ফাউন্ডেশনের মতে, আদিবাসী নারী হত্যা, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, শারীরিক নিগ্রহ, যৌন হয়রানি, অপহরণ, পাচারের মতো সহিংসতার শিকার ব্যাপক মাত্রায় বেড়ে চলেছে।[১৩]

এখন জন লকের তত্ত্বের আলোকে আদিবাসীদের অধিকার বিচার করা যাক। জন লক তাঁর *Two Treaties on Civil Government* গ্রন্থে জীবন, স্বধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে গণ্য করেছেন। লক এর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে নিজের সুখ ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করাই ছিল স্বাধীনতার লক্ষ্য। কিন্তু এ স্বাধীনতা আসে মানুষের শৃঙ্খলাবোধ ও আইন মেনে চলার শর্তে। এ আইন মানুষের সৃষ্ট আইন এ আইন স্বাধীনতার সংকোচন নয়, স্বাধীনতা প্রসারে কার্যকরী। এ স্বাধীনতা সুবুদ্ধি ও নৈতিকতাবোধ দ্বারা পরিচালিত, সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণের উপযোগী স্বাধীনতা। লক বোঝাতে চান, প্রকৃতির রাজ্য যেহেতু পৌর রাষ্ট্র নয়- স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আইনকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করার প্রবণতা থেকেই যায়। যেহেতু মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধের পার্থক্য আছে, সেহেতু নৈতিকতা বা সুবিচার ধারণাটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পায়। ফলে আমরা দেখতে পাই নৈতিকতা ও সুবিচারের সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে সেখানে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই রাজ্যে প্রতিটি মানুষই অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, প্রত্যেকেই ছিল সমান ও স্বাধীন, অভাব ছিল প্রকৃতির আইন সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট উপলব্ধি। প্রকৃতির আইন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপলব্ধির অভাবে একের অধিকারে অপরের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থেকে যায়-এর ফলে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ভোগের প্রশ্নটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে,

নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে নিরাপদ করতেই নিজেদেরকে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের শাসনাধীনে আনার প্রয়োজন অনুভব করল মানুষ।

লকের তত্ত্ব থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, ব্যক্তি নিজেদেরকে সরকারের অধীনে বা রাজনৈতিক চুক্তির অধীনে আনার পেছনে জীবন ও স্বাধীনতার নিরাপত্তার কারণ জরুরী ছিল; কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার বিষয়টি মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অধীনে এসে এই সম্পত্তি পরিপূর্ণভাবে রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ ও স্বাধীনতা পায়। লকের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মধ্যে নয়, জীবনকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে। সম্পত্তিই মানুষকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। লক সম্পত্তি কথাটির মধ্যে অন্যান্য অধিকারের তাৎপর্য দেখেছেন। এটি ব্যক্তির জন্মগত অধিকার, স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য অধিকারের মতো এ অধিকার মানুষ লাভ করেছে। সমাজের কাছে, প্রকৃতির রাজ্য বা রাজনৈতিক সমাজ উভয়ের কাছেই এই অধিকার তার অখন্ড দাবি- এ দাবিকে অস্বীকার করার বা আহত করার কোনো ক্ষমতা সমাজ বা সরকার কারো নেই।

লকের তত্ত্বকে আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণে প্রয়োগ করতে গেলে আমরা দেখি যে, আদিবাসীরা স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ, উন্নত ও সভ্য জীবনের জন্য যা পেয়েছে কিংবা পাওয়ার জন্য যে সব পদক্ষেপ রয়েছে সেগুলোকে বাস্তবায়নের উপলব্ধি প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় উপলব্ধির অভাবেই একের অধিকারে অপরের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থেকে যায়– এর ফলে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ভোগের প্রশ্নটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২ জীবনের অধিকারকে সাংবিধানিক এবং আইনি ভিত্তি দিয়েছে; তা শুধু যেনতেনভাবে বেঁচে থাকাকে বোঝায় না বরং মানুষ হিসেবে মর্যাদাসহ বেঁচে থাকাকে বোঝায়। এটি এমন একটি অধিকার, যা একটি রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থার সময়ও খর্ব করা যায় না। 'জীবনের অধিকার'- এর দার্শনিক ও আইনি ব্যাখ্যায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আদিবাসীদের জীবনের অধিকার যথার্থই সংরক্ষিত হয় না, কেননা আদিবাসীরা আত্মপরিচয় হিসেবে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারের সাধারণ মর্যাদাটুকু সংবিধানে অধিকার করতে পারেনি। আর সম্পত্তির অধিকারের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, মূল সম্পত্তি বলতে ভূমিকে বোঝানো হয় যা থেকে উৎখাত, জোর করে বেদখল আদিবাসী জীবনে একটি সাধারণ চিত্র। আদিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি হুমকির মুখে। নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ব্যবহার, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের মতো ন্যূনতম স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি।

এভাবে লকের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার আদিবাসীদের প্রতিদিনকার মানবাধিকার আন্দোলনের দাবি।

১০৭ ও ১৬৯ নম্বর আইএলও সনদ এবং সম্প্রতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ ঘোষণা দ্বারা আদিবাসী জনগগোষ্ঠীর অধিকার বিস্তৃতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করে এবং বর্ণ, ধর্ম, বাসস্থানসহ অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য করাকে নিষিদ্ধ করে। আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ কাজটি করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং মূল দায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের। তাদের ভাষা, সাহিত্যে ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য যাতে কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে ব্যাপারে প্রশাসন তথা সরকারকে কঠোর হতে হবে। সব কিছুর জন্য দরকার আদিবাসীদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও সংলাপ, আদিবাসীদের আস্থায় এনে কাজটি করতে হবে। সরকার বা প্রশাসনের ভুমিকা এক্ষেত্রে অবশ্যই লকের ধারণা অনুযায়ী ইতিবাচক হবে, তাদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। আদিবাসীরা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে কেবল অধিকার সুরক্ষার জন্য যা সামাজিক বা নাগরিক চুক্তির প্রতিফলন বলা যায়। আদিবাসীদেরও সহযোগীতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ভেরিয়ার এলুইন **তাঁর *আদিবাসী জগৎ*** বইয়ে লিখেছে- "পাহাড় ও সমতলের ঐক্য জাতীয় স্বার্থেও যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন পাহাড় ও অরণ্যের মানুষের স্বার্থে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ ও সম্ভবনাময় করতে পারি। আদিবাসীদের আমরা অনেক কিছু দিতে পারি, আবার ওদেরও অনেক কিছু আছে, যা আমাদের দেবার মত।"[১৪]

পার্বত্য এলাকায় সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নি। অপর দিকে সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসী জাতিগুলোর শক্তিশালী নেতৃত্ব নেই। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়েও আদিবাসী জাতিগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তত্ত্বাবধান করার কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি বা কাঠামো নেই। তাই আদিবাসী জাতিগুলোর মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল মানবাধিকার সংগঠনগুলোর জোরালো ভূমিকা অপরিহার্য।

উপর্যুক্ত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের মানবাধিকার সংরক্ষণে নিম্মোক্ত সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে:

- ✓ আদিবাসীদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সাংবিধানিক অধিকার ও স্বীকৃতি প্রদান;
- ✓ আদিবাসী অধিকার আইন প্রণয়ন, যেখানে ভূমির অধিকারসহ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বীকৃতি থাকবে;
- ✓ পার্বত্য চট্রগাম চুক্তি যথাযথভাবে ও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা এবং চুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা ও সংশোধন করা;
- ✓ জাতীয় আদিবাসী কমিশন গঠন করা;
- ✓ আই এল ও কনভেনশন -১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা।

তথ্য নির্দেশ

১. বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৩: আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর পর্যালোচনা, পৃ. ১, সূত্র: প্রথম আলো, ৫ মে ২০১৩।

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

৩. প্রফেসর পিয়েরে বেসিন, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, অনুবাদ-সুফিয়া খান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ.১০১।

৪. মাহমুদ, ফিরোজ, *বাংলাদেশের আদিবাসী*, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ১৯৯২ পৃ. ২২-২৩।

৫. *প্রাগুক্ত.*, পৃ. ৩৮।

৬. *প্রাগুক্ত.*, পৃ. ২৮।

৭. এস এম দোহা, *বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত*, অর্কিড প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.১৩৮।

৮. দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগষ্ট ২০১৩, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস।

৯. kohli, A.S., Sharma, S.R., *Encyclopedia of Social Welfare and Administration*, Vol.5, (Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 1996), p. 133.

১০. প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০১৫।

১১. ড. ডগলাস লারটন, রুজভেল্ট'স ফরেইন পলিসি, ১৯৩৩, ১৯৪১: ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, আন এডিটেন্ড স্পীচ (টোরেন্টো: লংম্যানস গ্রিন, ১৯৪২), ৩২৪।

১২. H. H. Risely, *Tribes and Castes of Bengal*, V-1 (Printed at the Bengal Secretariat Press, Calcutta, India, 1891), p.171.

১৩. মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০০৭, ঢাকা, পৃ.৩৪।

১৪. হাফিজ রশিদ খান, *আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি*, (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯), পৃ.৬৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ঃ মানবাধিকার বাস্তবায়নের তাৎপর্য

মানবাধিকার বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক মহলে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে এবং এরূপ অধিকার সরকার এবং তার নীতিনির্ধারক দ্বারা গঠিত সমাজের নিকট দাবি করা হয়। মানবাধিকারকে 'মৌলিক' বলেও বর্তমানে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ মানবজীবনের মর্যাদা এবং অন্যান্য উচ্চতর মানবচিন্তা সম্পর্কিত নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ব্যক্তি অধিকার অর্জন করে তার স্বাধীনতার মাধ্যমে। অধিকারণ আবার ব্যক্তিকে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মের ভেতর থেকে স্বাধীনতার চেতনার উম্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। অধিকারের ধারণা একটি শক্তির সংযোজন যে শক্তি স্বাধীনতার উম্মেষ ঘটায় বা কখনও নিঃশেষিত না হয়ে বরং প্রবাহমান থাকে। প্রতিটি অধিকার উপভোগ করার পিছনে বিশেষ অবস্থানের দাবি থাকে যা আরও দীঘায়িত হয়ে অন্যান্য অধিকারের সংযোজন ও নবায়নের দিকে ধাবিত হয়।

৬.১ মানবাধিকার বাস্তবায়ন

মানবাধিকার বাস্তবায়নের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার বাস্তবায়ন বলতে কি বোঝায়, আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের অসুবিধা, সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তব সম্মত সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করবো।

সাধারণভাবে জাতিসংঘ সারাবিশ্বে মানবাধিকার বাস্তবায়নের এক বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক কার্যক্রম কলতে শুধু জাতিসংঘের কার্যক্রমকে বোঝায় না। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ ও গবেষণা ইত্যাদি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের যে কোনো ব্যবস্থা যদি একটি রাষ্ট্র কাঠামোর উর্ধ্বে ওঠে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়, সেটিই আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের আওতায় পড়ে।

এই সংজ্ঞা গ্রহণ করার সাথে সাথে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মানবাধিকার বাস্তবায়নের যেসব পদ্ধতি চালু আছে সেগুলো সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। যদিও আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের আওতায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাস্তবায়নের

ব্যবস্থাগুলো প্রত্যক্ষভাবে বিবেচনার বিষয় নয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা এমন পারিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানুষের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলার চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ঐ অধিকারগুলো বাস্তবায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণই হলো আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এসব আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে মানবাধিকার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। মানবাধিকারের লক্ষ্য অর্জনে একটি রাষ্ট্র ঠিক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলো সেটি আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের আওতাভুক্ত নয়। যে ব্যবস্থাই নেয়া হোক সঠিক অর্থে মানবাধিকার বাস্তবায়িত হলো কিনা সেটিই হলো আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের বিবেচনার বিষয়।

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক বাস্তবায়ন এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সারা বিশ্বে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন- আদালতের বিচার ক্ষমতা, উচ্চতর আদালতের রীট ক্ষমতা, বিভিন্ন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, সরকারী কর্মচারীদের আচার-আচরণ তদারকির জন্য বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন, ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি ও তদারকির ক্ষমতা ইত্যাদি। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত। এসব অধিকারকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

তাহলে এতসব রক্ষাকবচের পরেও আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা হয় কেন? সমস্যাটির সমাধানকল্পে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিভিন্ন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই সে সব বিধান ও রক্ষাকবচ বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে। অধিকারহীন মানুষ দাবি জানাচ্ছে বিশ্বমানবতার দরবারে। বিশ্বমানবতার সম্মিলিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আন্তর্জাতিক কার্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে। সেজন্যই আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব এত অধিক।

অনেকে এ রকম মত পোষণ করেন যে, আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ওপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলে আন্তর্জাতিকভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব এড়ানো যায়। তাদের দৃষ্টিতে এটিই উত্তম ও সঠিক ব্যবস্থা। মূলত রাষ্টীয় কাঠামোতেই তো মানুষের অধিকার বাস্তবায়িত হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাস্তবায়নের ব্যবস্থাকে প্রাথমিকভাবে জাতীয় বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি মানবাধিকারের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো বা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনই ছিল না। যদিও আন্তর্জাতিক দলিলে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবু তা আন্তর্জাতিক বাস্তবায়ন বা আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, বিকল্পও নয়।

তাছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে সম্পাদিত চুক্তিও আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত। চুক্তির কোনো পক্ষ যদি চুক্তির শর্তানুযায়ী মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন না করে, তাহলে তা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে চুক্তিভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে ও চুক্তির দায়িত্ব বরখেলাপের জন্য আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণযোগ্য সব ব্যবস্থা নেয়া যায়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মানবাধিকার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা রাখলেও চুড়ান্ত পর্যায়ে চুক্তির ভিত্তি আন্তর্জাতিক আইনেই নিহিত।

৬.২ মানবাধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক মতের পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে 'আইনগত ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার চর্চা'। এক্ষেত্রে গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আমি আইনগত দিক থেকে অধিকারের স্বরূপ এবং অধিকার সম্পর্কে দার্শনিকদের আইনি তত্ত্ব তুলে ধরেছি। বিশেষ করে জন অস্টিন কীভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইনকে ব্যাখ্যা করেন এবং আইন কীভাবে অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ তা আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া চতুর্থ অধ্যায়ে নৈতিকতার সাথে মানবাধিকারের সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে 'নৈতিকতা' তথা 'ন্যায়বিচার' ভিত্তিক বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলোকে মানবাধিকার বাস্তাবায়নের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করতে পারি। নিম্নে আইনি ও ন্যায়বিচার বিষয়ক বিভিন্ন (অস্টিন, প্লেটো, রলস ও নজিক) দার্শনিকদের অধিকারতত্ত্ব মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে মানবাধিকার বাস্তবায়নের তাৎপর্য তুলে ধরব।

ব্রিটিশ আইনবিদ ও দার্শনিক জন অস্টিন আইন বলতে বুঝিয়েছেন সার্বভৌমের নির্দেশকে, তাঁর মতানুসারে আইনের পেছনে রয়েছে সার্বভৌমের শাস্তিদানের ক্ষমতা, নৈতিক সূত্র বা প্রথার সাথে আইনের কোনো সম্পর্ক নেই। অস্টিন প্রচলিত প্রথা বা নীতিগত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আইনকে ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর মতে, সার্বভৌম হলো আইনের উৎস। সার্বভৌমের সংজ্ঞায় অস্টিন বলেন, যদি কোনো সমাজে কোনো নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন (ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ) অন্য কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষের বশ্যতা বা আনুগত্য স্বীকার না করে, অথচ সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে তবে ওই নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন (ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ) হলেন সেই সমাজের সার্বভৌম এবং উর্দ্ধতন কতৃপক্ষকে নিয়ে গড়ে ওঠা এই সমাজ হলো রাজনৈতিক ও স্বাধীন। সার্বভৌম সর্ম্পকে অস্টিনের সংজ্ঞা বিশ্লষণ করলে যা পাওয়া যায়- সার্বভৌম শক্তি একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ, সার্বভৌম ক্ষমতা হলো চরম, অবাধ ও অসীম। সার্বভৌমের আদেশই হলো আইন। জনগণের স্বভাবগত আনুগত্যই সার্বভৌমিকতার ভিত্তি, সার্বভৌমের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে কেবল রাজনেতিক ও স্বাধীন সমাজে।

অস্টিন আইনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেভাবে সার্বভৌমকে অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত করে তুলে ধরেন তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকদের মধ্যে হেনরী মেইন, ল্যাস্কি, লীকক, সিজউইক প্রমুখ দার্শনিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁর *A Grammar of politics* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, অস্টিন আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সার্বভৌম ক্ষমতাকে যেভাবে চূড়ান্ত, অবাধ ও অসীম বলে মনে করেন তা কৃত্রিম এবং অবাস্তব। তাঁর মতে, এ ক্ষমতা অন্য কোনো শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু বাস্তবে আজ পর্যন্ত কোনো সার্বভৌম সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়নি। ল্যাস্কি আরো বলেন, অস্টিন তাঁর তত্ত্বে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা গণসার্বভৌমত্বের ধারণা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। অথচ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা জনমত হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মূল চালিকা শক্তি। সুতরাং আইন সম্পর্কিত অস্টিনের ধারণা গণতন্ত্রসম্মত নয়। এই সার্বভৌমের ইচ্ছাপ্রসূত পীড়নমূলক আইন গণতান্ত্রিক আদশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই মতবাদ জনগনের ইচ্ছা, অধিকার বা স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। বস্তুত জনমত গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাব ও নির্বাচকমন্ডলীকে একত্রে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বলা হয়, যার কাছে আইনগত সার্বভৌমত্বকে সর্বদা নতি স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ আইনগত সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অস্টিন আইন বলতে কেবল সার্বভৌমের নির্দেশকে স্বীকার করেন। কিন্তু হেনরী মেইনের মতে, প্রত্যেক দেশেই দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বহু প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার যা সার্বভৌমের নির্দেশ নয়, কিন্তু এগুলো আইনের মত কার্যকরী হয় যা কোনো শাসকের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। অস্টিন প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার, নিয়ম-শৃংঙ্খলার পরিবর্তে পীড়নমূলক শক্তির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, শক্তি প্রয়োগ বা শক্তির ভয়ে লোকে আইন মান্য করে চলে। বস্তুত এ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়, বিভিন্ন রাজনীতিক ও সামাজিক কারণে মানুষ অভ্যাসবশে আইন মান্য করে চলে। নানা কারণে লোকে আইন মানতে অভ্যস্ত বলেই আইন কার্যকরী হয়। লর্ড ব্রাইস আইন মান্য করার কারণ হিসেবে নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় ও যৌক্তিকতার উপলব্ধির কথা বলেছেন।

সিজউইক, ল্যাস্কি প্রমুখ সমালোচকগণ মন্তব্য করেছেন যে, অস্টিন আইন ও পীড়নমূলক শক্তিকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু কোকার, ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসনের মতে, অস্টিনের তত্ত্বে এরূপ অভিন্নতার কথা কোথাও বলা হয়নি। অস্টিন এমন মূর্খ ছিলেন না যে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অর্থে সরকারের স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন।[১] প্রকৃত প্রস্তাবে অস্টিন তাঁর সংজ্ঞায় সার্বভৌম শক্তির পিছনে জনগণের স্বভাজাত আনুগত্যের সমর্থনের কথা বলেছেন। এর দ্বরা অস্টিন সার্বভৌমত্বকে জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাছাড়া, অস্টিনই সর্বপ্রথম সার্বভৌম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণার সৃষ্টি করেছেন। সার্বভৌমের আইনগতরূপটি অস্টিনের তত্ত্বেও মধ্যেই স্পষ্ট

হয়ে উঠেছে। গার্নার-এর মতে, সার্বভৌমত্বের আইনগত চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অস্টিনের তত্ত্ব মোটের ওপর সুস্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ।

নৈতিক দিক থেকে প্লেটোর ন্যায়বিচারের ধারণা সমর্থনযোগ্য হলেও বাস্তবে এ ধারণার মূল্য কতটুকু তা বিচার করা দরকার। প্লেটোর ন্যায়বিচার ধারণার সবচেয়ে কঠিন সমালোচনা করেছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার Karl Popper তাঁর *Open Society and its Enemies (vol.1)* গ্রন্থে প্লেটোকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী (Totalitarian Theory) তত্ত্বের প্রবক্তা বলে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, অধিকার বাস্তবায়নে যে অর্থে ন্যায়ের ধারণাকে আমরা বিচার করি প্লেটোর চিন্তা সেই দিকে অগ্রসর হয়নি। ন্যায় বলতে আমরা বুঝি সমাজে দায়িত্বের সমবণ্টন, আইনের চোখে সমানাধিকার, আইনের পক্ষপাতহীন আচরণ, বিচারালয়ের নিরপেক্ষ বিধান এবং নাগরিকের মধ্যে সমাজের সুবিধাবলির সমবণ্টন। কিন্তু প্লেটো যে ন্যায়ের কথা বলেছেন তাতে সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের কল্যাণ বা স্বার্থের প্রশ্নটিই গুরুত্ব পেয়েছে। এই রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী যা কিছু তাকেই প্লেটো অন্যায় বা অবিচার বলে উল্লেখ করেছেন। পপার বলেছেন, সমস্ত কিছু পরিবর্তেনের গতি রুদ্ধ করা, শ্রেণি পার্থক্য ও শ্রেণি সুবিধা বজায় রাখাই প্লেটোর চোখে ন্যায়। শ্রেণিবিভেদ ও শ্রেণি-সুবিধার সাথে ন্যায়নীতিকে জড়িয়ে ফেলে প্লেটো তাঁর রাজনৈতিক প্রস্তাবকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন।[২]

কার্ল পপার প্লেটোর তত্ত্বকে অ-মানবাতাবাদী (Anti-humanitarian) বলেও অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ন্যায়ের মানবতাবাদী তত্ত্ব তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে : ১. সমতার নীতি গ্রহণ অর্থাৎ স্বাভাবিক সুবিধার নীতি বর্জন, ২. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণার স্বীকৃতি এবং ৩. নাগরিকের স্বাধীনতা সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা। পপার লক্ষ্য করেছেন প্লেটোর মতবাদ, এই তিনটি ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাকে সমর্থন করে- ১. স্বাভাবিক সুবিধার নীতি, ২. বিশুদ্ধতাবাদ বা সমস্টিবাদের সাধারণ নীতি, এবং রাষ্ট্রের শক্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষায় ব্যক্তির ভূমিকা। প্রথমত: সাম্য অর্থ রাষ্ট্র কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেক নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিবে, যাতে সকলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমান সুযোগ পায়। এই অর্থে সাম্য প্রত্যেকের আত্মোপলব্দিতে সহায়তা করে। কিন্তু প্লেটোর ধারণায় সৈনিক ও কারিগর শ্রেণি এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিতহয়। তাঁর মতে, প্রজ্ঞার অধিকারী অভিভাবক শ্রেণি কেবল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হবে। দ্বিতীয়ত: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ব্যক্তি তার আত্মোপলব্দি ও অধিকারবোধে সচেতন। কিন্তু প্লেটোর চিন্তায় ব্যক্তির অধিকারের পরিবর্তে সমষ্টি অর্থাৎ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রকে মূখ্য করে

তোলা হয়েছে। তৃতীয়ত: প্লেটো নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় রাষ্ট্রের ভুমিকার পরিবর্তে রাষ্ট্রে শক্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষায় ব্যক্তির কর্তব্য ও ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সাম্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সমকালীন সমাজের প্রবণতাকে অস্বীকার করে প্লেটো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শ্রেণি-শাসনের দাবিভিত্তিক এক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী নৈতিক তত্ত্ব।[৩]

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের বিরুদ্ধে অন্য একটি অভিযোগ হলো তাঁর ধারণা আধুনিক ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি শ্রেণি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ও রাষ্ট্রের বিকাশ সাধনে নিজস্ব অবদান রাখতে পারলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। প্লেটোর দৃষ্টিতে শ্রেণি-শাসন ও শ্রেণি-সুবিধার নীতিটি ন্যায় হলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শ্রেণি-সুবিধার অনুপস্থিতিকে ন্যায় বলে মনে করেন। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাধারা পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা, কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই মূখ্য বিষয়। কিন্তু প্লেটো শাসক শ্রেণির আধিপত্য বা শাসন করার একচেটিয়া অধিকারকে তিনি ন্যায় বিচার বলেছেন।[৪]

অধ্যাপক কার্ল পপার প্লেটোর ব্যক্তিবিদ্বেষী মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে ব্যক্তিকে নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকতে বলা হয়েছে। অথচ ব্যক্তির অধিকার কি বা ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য কি সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। ব্যক্তির দাবি বা অধিকারের মূল্যকে বিচার না করা, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির অধিকারে ভারসাম্য বিধানে চরম অনীহা এবং ব্যক্তিকে ছোট করে দেখার প্রবণতা, পপারের মতে প্লেটোর 'Radical Collectivism' ধারণাকেই প্রতিষ্ঠা করে।[৫] Radical Collectivism ব্যক্তিস্বার্থকে সমষ্টিস্বার্থের অধীন, অংশকে সমষ্টির চেয়ে বড় নয় মনে করে। *Laws*[৬] গ্রন্থে প্লেটো ব্যক্তিকে আত্মস্বার্থবাদী/অহংবাদী (egoist) ও স্বার্থপর বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তির এই অহংবাদীতা ও স্বার্থপরতা রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপদস্বরূপ-একথা ভেবেই প্লেটো সমষ্টিবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন।

তবে সমালোচনা ও অভিযোগ স্বত্ত্বেও বলা যেতে পারে, আধুনিক কালে আমরা ন্যায়বিচার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করি প্লেটোর ধারণা এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ছিল। একটা আদর্শ মানব সমাজে ন্যায় বিচারের চরিত্র কি জাতীয় হতে পারে তা নিয়ে তিনি ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং তার ফল হলো ন্যায়বিচার তত্ত্ব।[৭]

সমকালীন সমাজের শাসনপ্রণালী, নাগরিক অধিকার, কর্তব্য এ সবকিছুকেই প্লেটো নীতির আলোকে বিচার করেছেন। মানুষের অধিকার ও কর্তব্যকে আইনগত দৃষ্টিতে না দেখে নৈতিক মূল্যের বিচারেই দেখেছেন তিনি। আবার Wayper -এর মতো অনেক চিন্তাবিদ প্লেটোকে ব্যক্তিস্বার্থ বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করতে চাননা। তাঁর মতে, প্লেটো তাঁর তত্ত্বে ব্যক্তিকে যুক্তিবাদী, পরমতসহিষ্ণু ও পরকল্যাণকামী দেখতে চেয়েছেন। এই পূর্বশর্ত মেনে নিলে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে কোনোবিভেদ থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের কল্যাণ মানে ব্যক্তির কল্যাণ।[৮] প্লেটোর এই ধারণা জৈববাদী তত্ত্বের প্রতি তাঁর বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে।

John Rawls এর *A Theory of Justice* গ্রন্থ প্রকাশের পর রাজনৈতিক দার্শনিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন- Robert Nozik তাঁর *Anarchy, State and Utopia* গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, রলসের *Theory of Justice* গ্রন্থটি মূলত অনৈতিহাসিক; কারণ তিনি বলেন, সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বণ্টন হবে। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রী কে উৎপাদন করল, উৎপাদনের সাথে দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের সম্পর্ক নিয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। রলস অসাম্য দূর করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিতে আস্থা না রেখে নির্ভর করেছেন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর। তাই Robert Nozik রলসের এর উৎপাদন তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটো আপত্তি উত্থাপন করেন।

প্রথমত: রলসের ধারণা অবাস্তব। কারণ তিনি কেবল বণ্টনের কথাই বলেছেন। রলস মনে করেন, দ্রব্য অফুরন্ত; কেবল বণ্টনেই সমস্যা। বণ্টন বলতে বোঝায় উৎপাদিত দ্রব্যের যে অংশ ব্যক্তির ভাগে পড়ে অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য ব্যক্তির মধ্যে যেভাবে ভাগাভাগি হয় তাই বণ্টন। উৎপাদন ও বণ্টন পরস্পর সম্পর্কিত। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর ব্যক্তির প্রাপ্যতা নির্ভর করে অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তার সামাজিক সম্পর্কের ওপর। ফলে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী প্রাপ্য নির্ধারিত হয়। রলস যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সমর্থন করেন তাতে বিভিন্ন শ্রেণি র মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে তাতে এ ধরনের বণ্টন সম্ভব নয়। কেননা এ ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর সমস্টিগত মালিকানা থাকেনা।

দ্বিতীয়ত: রলস ন্যায়বিচার তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বাধীনতা ও সমতার নীতির কথা বলেন। নজিক এ দুটি ধারণার সমালোচনা করে বলেন, এ দুটি আরোপিত। স্বাধীনতাকে তিনি যেভাবে শ্রেণি-

বিভাজন করেছেন, মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাকে যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, মৌলিক স্বাধীনতা নিয়ে মানুষের বিরোধ নেই বলে যেভাবে ভেবেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি সমূহের মূল চাহিদাকে একই বৃত্তে রেখে, এমনকি তাদের প্রকৃতি, মানসিকতাকে একই মানে বিচার করে রলস নিজেকে পূর্বনির্ধারণবাদী করে তুলেছেন বলে মনে করা হয়। এভাবে রলসের ন্যায়বিচার তত্ত্বের বিরুদ্ধে নজিক তাঁর উদারনৈতিক মতবাদ দাঁড় করান এবং এতে লকের 'অধিকার' সংক্রান্ত ধারণার সাহায্য নেন।

জন গ্রে রলসের তত্ত্বকে কাল্পনিক অনুমান বলে অভিযোগ করেন। রলস যে সামাজিক ন্যায়ের প্রকল্প করেছেন তা মানুষের সমষ্টিগত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। সমতা ও মানুষের ন্যায়বোধ, সামাজিক ভাবনা নিয়ে তিনি যতটা আশা প্রকাশ করেছেন বা 'বেশি-কম' কৌশলের যে নীতিকে তিনি পেশ করেছেন তা বাস্তবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। জন গ্রে মনে করেন, যদি ধরে নেওয়া যায় ইতিহাসের কোনো এক মুহূর্তে এই ধরণের ঐকমত্য পাওয়া গেল, তাহলেও তা স্থায়ী এবং সুনির্দিষ্ট হবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। সমাজের স্বার্থে, পিছিয়ে-পড়া মানুষের স্বার্থে, তাঁর কল্পিত গণতান্ত্রিক ন্যায়নির্ভর সমাজের মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর।[৯] কেননা, রলস যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন তা বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক। এর মূল কারণ সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা। ফলে একটি শ্রেণি অন্যদের তুলনায় ভালো অবস্থানে থাকার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

David L. Schaefer রক্ষণশীল উদারতাবাদী দৃষ্টিতে রলসের তত্ত্বকে 'একটি ভাববাদী বিস্তার', 'রাজনৈতিক কুসংস্কারের একটি ব্যাপক তালিকা', 'অস্পষ্ট', 'বিমূর্ত' এবং 'অসঙ্গতিপূর্ণ' বলে অভিযুক্ত করেছেন।[১০] তাঁর সমতার দর্শন প্রচলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দর্শন, ভোগবাদী দর্শনকে অতিক্রম করে গেলেও অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ: ১. অসাম্য দূর করতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিতে তাঁর আস্থা নেই। তিনি নির্ভর করেছেন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর গড়ে ওঠা এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর। এই গণতন্ত্র সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে কিন্তু প্রচলিত কাঠামোর অসংগতি, শ্রেণি পক্ষপাতিত্ব নিয়ে তিনি কিছুই বলেননি। ২. সাম্যের ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে অর্থনীতিকে উৎপাদনমুখী করতে হবে, সুপরিকল্পিত উপায়ে অর্থনীতি পরিচালনা করতে হবে, উৎপাদনের উপায়ের সমষ্টিগত মালিকানা থাকবে। রলসের ভাবনায় এসব আসেনি। ৩. পিছিয়ে পড়া মানুষকে সুবিধা দেবার প্রয়োজনে অসাম্যকে ন্যায় প্রতিপন্ন করেছেন রলস। কিন্তু প্রশ্ন হলো অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণ নীতি বাজার অর্থনীতির প্রকল্পে কার্যকর হবে কিনা। মহিলা, শিশু, অভিবাসী, নিম্নবর্ণের মানুষ

প্রভৃতির উন্নয়নের প্রশ্নে প্রান্তিক মানুষের সমস্যার সমাধান বা মানবাধিকারের প্রশ্নে এই নীতি আশাব্যাঞ্জক নয়।

তবে উপর্যুক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায়, রলসের চুক্তি সংক্রান্ত পদ্ধতি এমন এক ধরনের অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি যা প্রমাণের পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তার মূল লক্ষ্য ছিল ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মতে, একমাত্র সুষ্ঠু বণ্টনের মধ্য দিয়েই তা করা সম্ভব। তাঁর এই সুষ্ঠু প্রক্রিয়াটি এক ধরনের বিরুদ্ধ কার্যপ্রণালী।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন রলসের ন্যায়বিচার তত্ত্বে আস্থা প্রকাশ করেননি। যদিও তিনি রলসকে সমসাময়িক যুগের ন্যায় তত্ত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং নানাভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টা বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। অমর্ত্য সেন মনে করেন, জন রলসের তত্ত্বে স্বাধীনতার অগ্রাধিকারকে যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে সেটি সঠিক নয়। রলসের মতে, স্বাধীনতার সমানাধিকারের নীতিটি সুযোগের সমতার নীতির আগে থাকবে। আর্থিক প্রয়োজনকে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিচে স্থান দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। স্বাধীনতার অগ্রাধিকার থাকতে পারে, কিন্তু অমর্ত্য সেনের মতে, এই মতবাদের এমন কোনো ফলাফল হবেনা যে আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করতে হবে। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে পৃথক করে দেখা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাতেই স্বাধীনতার সংঘাত উপস্থিত হলে প্রাধান্য দেবার রলসবাদী প্রস্তাবকে ড. সেন সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন, প্রাধান্যটি মূল প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্যান্য ব্যক্তিগত সুবিধার (আয়, উপযোগিতা ইত্যাদি) তুলনায় কি প্রাধান্য পেতে পারে? ড.সেনের মতে, স্বাধীনতাকে সরলভাবে একটি সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয় (যেমন অধিক আয়), যে সুবিধা ব্যক্তি ওই স্বাধীনতা থেকেই লাভ করে। রলস উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গৃহীত ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতা নিয়ে পছন্দের অগ্রাধিকারের নীতিকে সমর্থন করেন নি। সেনের মতে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, মতামত, ধর্মীয় স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা সম্ভব। স্বাধীনতার রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের গঠনমূলক ভূমিকার ওপর অমর্ত্য সেন গুরুত্ব দেন।[১১] রলসের ন্যায়ের স্বচ্ছতার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিবেচনা যেমন যোগ্যতা বা সামর্থকে কদাচিৎ পরিবেশন করা হয়। কিন্তু ন্যায়ের এই তত্ত্বে একে অবশ্যই একীভূত করতে হবে। যোগ্যতা ও সুবিধার নীতি স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘন দূর করার জন্য এ দুটি নীতি বিকল্প হিসেবে গ্রহণ এবং সদ্ব্যবহার করতে হবে বলে ড. সেন মনে করেন।

ব্যক্তির অধিকার সমুন্নত করতে রবার্ট নজিক তাঁর *Anarchy, State and Utopia* গ্রন্থে স্বাধীনতাবাদী উদারনীতি প্রচার করেন। তিনি ন্যূণতম রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, যে রাষ্ট্রকে তিনি সুরক্ষা সমিতি হিসেবে বিবেচনা করেন। ব্যক্তির জীবন, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকারের বাইরে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্থার অগ্রাধিকার থাকতে পারে একথা তিনি স্বীকার করেন না। নজিক ন্যায়ের এমন এক স্বত্বতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন যার মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির সম্পত্তির সুরক্ষা দান। এক্ষেত্রে তিনি রাজনেতিক বা সামাজিক সংস্থার অস্তিত্বকে কেবল ব্যক্তির প্রয়োজনে স্বীকার করেন। রাষ্ট্র বা অন্যান্য সংস্থার অগ্রাধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও অধিকারে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা আরোপ করতে পারে যা কাম্য নয়। রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নানাভাবে অর্জিত ও প্রাপ্ত বৈধ সম্পত্তির ওপর কোনো বল প্রয়োগ না করে বরং সুরক্ষা করবে। মানুষই রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিয়েছে। মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করতেই মানুষ রাষ্ট্রের মতো এক সংগঠন সৃষ্টি করেছে। শুধু সাহায্য ও পরিসেবার বাইরে রাষ্ট্রের কোনো কাজ নেই। সম্পত্তিভোগী মানুষের কাছে এই রাষ্ট্র সম্পত্তির রক্ষক মাত্র। সম্পত্তির কোনো হস্তক্ষেপ বা লঙ্ঘন হলে রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ন্যূণতম রাষ্ট্রের নৈতিকতার কোনো সরকারি বা সামাজিক অধিকার বণ্টন, কোনো ধারণাই তার কাছে গুরুত্ব পায় না।

নজিকের স্বাধীনতাবাদী উদারনীতি তত্ত্বকে সমালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমকালীন রাজনৈতিক দর্শনকে আরও এগিয়ে নেন জেমস বুকানন ও রোনাল্ড ডকিন। জেমস বুকানন তাঁর *The Limit of Liberty* (1975) ও *Freedom in Constitutional Contract* (1977) গ্রন্থদ্বয়ে রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিকভাবে এমন করে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন যাতে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের স্বার্থ সীমাবদ্ধ করে ব্যক্তিগত পছন্দকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি নজিকের এর মতো রাষ্ট্রকে সংরক্ষণকারী ন্যূনতম রাষ্ট্র হিসেবে না ভেবে, উৎপাদন ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়োজিত হোক তা চেয়েছেন।

রোনাল্ড ডর্কিন তাঁর *Taking Rights Seriously* (1978) গ্রন্থে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যকে জুড়ে দিয়ে (সব মানুষের সমান মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য) উদারনৈতিকতাকে রাজনৈতিক সমাজের যুক্তিযুক্ত তাত্ত্বিক ভাবনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে করেন, সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার স্বার্থেই, মানুষের ভালো জীবনের স্বার্থেই সমতাকে কার্যকর করা প্রয়োজন। নজিক রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পাশে একটি ক্ষুদ্র স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির ওপর কোনো বাইরের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। ডর্কিন বলেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে এবং রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে (সাংবিধানিক গণতন্ত্র)

ও সমতার দর্শন মেনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলেই ভালো।[১২] তাঁর মতে নজিক জনকল্যাণকে অসুবিধার কারণ হিসেবে দেখেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে চান। নজিকের স্বাধীনতাবাদী এই তত্ত্বে রাষ্ট্রবিরোধীতার যে প্রবণতা আছে তার পেছনে একদিকে আছে সমাজতন্ত্রের বিপদ থেকে স্বাধীনতাকে বাঁচানো, ব্যক্তির দক্ষতা, উদ্যোগ ও দায়িত্বশীলতাকে প্রসারিত করা এবং বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদী নৈরাজ্যের এক অবস্থাকে স্বাগত জানানো। ডর্কিন বা রলস উদারতাবাদের এই বাজারি মোহ থেকে সরে এসে একে সমতা, ন্যায়, নৈতিকতা ও জনকল্যাণের পথে পরিচালিত করতে চান এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে গুরুত্ব দেন।

৬.৩ মানবাধিকার বাস্তবায়ন কে বা কারা করবে?

জাতিসংঘ প্রণীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' এর কোনো বাস্তবায়ন পদ্ধতি নেই। তবে এর অধীনে যে চুক্তিগুলো হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের যেসব কৌশল নির্ধারিত আছে যেগুলো খুবই দুর্বল। ফলে জাতিসংঘসহ রাষ্ট্রসমূহের অন্যান্য সংস্থাও মানবাধিকার বাস্তবায়নের দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতেই পুরোপুরি সঁপে দিয়েছে। সে দিক থেকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হলো মানবাধিকারকে সম্মান, সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়ন। অনেকে মনে করেন যে, কোনো রাষ্ট্র যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাহলে পরাশক্তিগুলো আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে (যেমন জাতিসংঘ) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তারা তাদের আকাঙ্খার সঙ্গে বাস্তবতাকে এলোমেলো করে ফেলেন।[১৩]

উপসংহারে আমি মানবাধিকার বাস্তবায়নের দায়ভার নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। এক্ষেত্রে তিনটি অনুসিদ্ধান্ত তুলে ধরতে পারি-

প্রথমত : মানবাধিকার সমুন্নত রাখার দায়িত্ব ব্যক্তির;

দ্বিতীয়ত : মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের বা সার্বভৌমের;

তৃতীয়ত : ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ই মানবাধিকারের উদ্দেশ্য/লক্ষ্য।

প্রথমতঃ ব্যক্তি নিজে মানবাধিকার লঙ্ঘন করবেনা- এ দায় তার। তাছাড়া, সরকার যাতে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সে ব্যাপারে সরকারকে উৎসাহিত করার দায়িত্বও তার। গণতান্ত্রিক নীতিমালার আওতায় নিজ নিজ সরকারের কার্যকলাপের জন্য ব্যক্তি পর্যায়েও কিছু দায়িত্ব থাকে। 'জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার' এ আপ্তবাক্যটির মধ্যে সত্যতা থাকলেও রাজনৈতিক অংশীদারির অধিকার জনগণের দায়দায়িত্ব।

মানবাধিকার তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ কতগুলো অধিকার নিয়েই জন্মায় এবং সেসব অধিকার তার ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের এই স্বভাবজাত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে সহজাত বা প্রাকৃতিক অধিকার বলে অভিহিতো করা হয়। এই অধিকারগুলো সহজাত ও প্রাকৃতিক বলে একদিকে তা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির উর্ধ্বে অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ সমান ও স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। তাদের রয়েছে বিবেক ও যুক্তিবাদী মন এবং তারা একে অনের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত। এখানে মানব মর্যাদা ও যুক্তিবাদীতাকে

মানবাধিকারে ভিত্তি দেখানো হয়েছে। নৈতিকসত্তা হিসেবে মানবিক মর্যাদার এ বিষয়টি কান্টের দর্শনে লক্ষ্য করা যায়। কান্ট তাঁর *Metaphysic of Morals* গ্রন্থে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য জগতের আইন প্রণেতা হিসেবে অভিহিত করেন যেখানে ব্যক্তি নিজে সেই আইনের অধীন। কান্ট বোঝাতে চান ব্যক্তি যেমন নিজেকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করবে অনুরূপভাবে অন্যকেও বিবেচনা করবে, কখনও উপায় হিসেবে নয়। ফলে ব্যক্তি যেমন নিজের অধিকারবোধে সচেতন হবে তেমনি অন্যের অধিকার, স্বার্থের হানি ঘটবে এমন আচরণ করবে না। এভাবে মানবাধিকার বাস্তবায়নে ব্যক্তি দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রধান দায়ভার সরকারের। সর্বত্র জনগণের অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নত রাখার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, মানবাধিকার সর্বজনীন ও স্বাভাবিক হলেও এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরই ন্যস্ত। এ দৃষ্টিতে অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি ও সংরক্ষিত দাবি।

প্লেটো, এরিস্টটল সহ প্রাকৃতিক অধিকারের সমর্থক এবং সামাজিক চুক্তিবাদী বিভিন্ন দার্শনিক অধিকার রক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলেন। হকস, লক, রুশো প্রমুখ দার্শনিকগণের মত অনুসারে বলা যায়, মানুষ প্রকৃতির রাজ্য থেকে আইনের রাজ্যে এসেছে নিছক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়, তার অধিকার সুরক্ষিত ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে। সার্বভৌম ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নের শাসনাধিকার প্রয়োগ করেছে জনগণ। কেননা রাজনৈতিক সমাজে মানুষের পরিচয় নাগরিক হিসেবে, যে অধিকার ভোগ করবে, আবার অধিকার ব্যাহতো হলে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ করবে।

এই দায়দায়িত্বগুলো কেবল নেতিবাচক নয় (লঙ্ঘন করার নয়), ইতিবাচকও বটে (সমুন্নত রাখার বা বাস্তবায়িত করার)। বহুদেশেই তাদের ভূখন্ডের অধিবাসীদের অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ও অধিকারগুলো সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এ দায়িত্ব জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনকে দেয়ার আগ্রহ বাড়বে কিংবা ঐ অধিকারগুলোর দায়িত্ব নেয়ার জন্য অচিরেই একটি বিশ্বরাষ্ট্র কিংবা বিশ্বসরকারের অভ্যুদয় ঘটবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয়: মানবাধিকার বাস্তাবায়নে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়য়েরই দায়িত্ব রয়েছে। উপরিউক্ত দুটি অনুসিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণে

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে পৃথকভাবে বিবেচনা না করে বরং উভয়ের একসাথে ফলপ্রসূ ভূমিকাকে তুলে ধরতে পারি এবং সেটাই হবে যুক্তিযুক্ত। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যেমন নিজের ও অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান হবে তেমনি রাষ্ট্রও আইনের শাসন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকারকে সমুন্নত রাখবে। দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণে উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন প্লেটোর কাছে রাষ্ট্র হলো। সেই আদর্শ যার মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও গুণাবলী প্রতিফলিত হয়। তাঁর মতে, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করাই রাষ্ট্রের ধর্ম। এক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনে কেমন করে ন্যায়বিচারের আদর্শ বিকশিত হয় মূলত সেই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রে ন্যায়বিচারের আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক অধিকার থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করলেও প্লেটো তাদের আর্থিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। ব্যক্তিকে গৌণ বা ছোট করে দেখা প্লেটোর উদ্দেশ্য ছিল না। অধিকারবোধে নয়, কর্তব্যবোধে ও সেবাধর্মে সচেতন করতে চেয়েছেন প্লেটো ব্যক্তিমানুষকে। এভাবে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম করে রাষ্ট্রের কল্যাণের মধ্যে ব্যক্তির কল্যাণ খোঁজ করেন।

জন রলস তাঁর 'ন্যায়বিচার' তত্ত্বের মাধ্যমে অধিকারের যে তত্ত্ব উত্থাপন করেন তাতে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ন্যায়বিচারকে চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করে তুলতে নাগরিক বিচারবুদ্ধি, অনুভূতি ও ঐকমত্য জাগ্রত করতে হবে । অর্থাৎ তিনি ব্যক্তির ভূমিকাকে তুলে ধরেন। আবার দেখা যায় রলসের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকারবোধ ও চেতনাকে মূল্য দেয়, নাগরিকের বিচিত্র নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান স্বীকার করে। অর্থাৎ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আবার রবার্ট নজিক তাঁর ন্যূনতম রাষ্ট্রের ধারণায় সাহায্য ও পরিসেবার বাইরে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই বলে মনে করেন। সম্পত্তিভোগী মানুষের কাছে এই রাষ্ট্র সম্পত্তির রক্ষক মাত্র, সম্পত্তির কোনো হস্তক্ষেপ বা লঙ্ঘন হলে রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

নজিকের মতে, ব্যক্তি নিজেই তার স্বাধীনতার কর্তা; ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্ব-নিয়ন্ত্রণের কথা বলে তিনি ব্যক্তির মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। ব্যক্তি নিজের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এটাই তিনি আশা করেন। এ ব্যাপারে তিনি ব্যক্তি ও সরকার উভয়ের কর্তব্যের কথা বলেন। সরকার কোনো ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘন না করায় দায়বদ্ধ। এভাবে রবার্ট নজিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে সরকার বা রাষ্ট্রের দায়িত্বকে প্রধান হিসেবে দেখেন। মোট কথা মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও সমুন্নত করতে ব্যক্তি ও সরকার বা রাষ্ট্র উভয়ের যৌথ ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৪ মানবাধিকার বাস্তবায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি

আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মানবাধিকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে বা নেয়া যেতে পারে। এসব ব্যবস্থা বা পদ্ধতিকে (ক) রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বাস্তবায়ন, (খ) আইনগত বাস্তবায়ন, (গ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাস্তবায়ন ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। বাস্তবায়নের বাস্তব পদ্ধতি ও ব্যবস্থার আলোকে এসব নামকরণ করা হয়েছে। তবে এরকম নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক কথা সম্ভব নয়। কেননা একটি ব্যবস্থা অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটি পদ্ধতি আলোচনা করেত গিয়ে অন্য পদ্ধতিটি এসে পড়া স্বাভাবিক। প্রথমত: রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বাস্তবায়নের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হলেও অরাজনৈতিক বাস্তবায়নের ব্যবস্থাকে আবার আইনগত বা আইনগত নয় এরকম ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বাস্তবায়নের মধ্যেও পার্থক্য নির্ণয় করা চলে। এ ধরনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহই কেবল সদস্য হতে পারে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এসব চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। যদিও যেকোনো চুক্তির লক্ষ্য জনগণই, তবুও তারা এ ধরনের চুক্তিতে আন্তর্জাতিক ফোরামে সরাসরি নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে পক্ষ হিসেবে উপস্থিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, 'প্রত্যক্ষ' বাস্তবায়ন অর্থ একটি চুক্তির ফলে নাগরিকরা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে নাগরিকগণ ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থার সামনে পক্ষ হিসেবে উপস্থিত হতে পারে।

তবে বাস্তবক্ষেত্রে মানাবধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্চণীয় বলে বিবেচনা করা যায়। যেমন- ফসেট[১৪] বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য তিনটি প্রধান হাতিয়ারের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- (ক) প্রচার; (খ) আইনগত ব্যবস্থা ও আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং (গ) আন্তর্জাতিক তদারকি। উপরোক্ত শিরোনামের আওতাতে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার বাস্তবায়নের বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। যেমন-

প্রচার: মানবাধিকার বাস্তবায়নের সপক্ষে প্রচার চালানোর অধিকারও একটি মৌলিক অধিকার। মানবাধিকার কি ও কেন এবং কীভাবে এসব অধিকার সংরক্ষণ করা যায়, কোনো কোনো কাজ দ্বারা

মানবাধিকার ভঙ্গ হয়, এসব অধিকারের প্রয়োজনীয়তা কী ইত্যাদি বিষয় যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার অত্যাবশ্যক। এছাড়া মানবাধিকার বিরোধী শক্তি কে, কারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, তাদের কায়েমী স্বার্থের স্বরূপ উদঘাটন করা দরকার। বিশ্বের জনগণ তাদের নিজ নিজ অধিকারের মর্যাদা উপলব্ধি করলে সেসব অধিকার বাস্তবায়নেও সক্রিয় হতে থাকবে।

জেরেমি বেনথাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সাফল্যের সবটুকু প্রচারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আসলে 'প্রচার' বিষয়টিকে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। তিনি ১৭৮৬-৮৯ এর মাঝামাঝিতে তাঁর *Plan for a Universal and Perpetual Peace* গ্রন্থে প্রচার শক্তিকে বিশ্বশান্তির পক্ষে বলিষ্ঠতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তি

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য শ্রেষ্ট হাতিয়ার হচ্ছে আদালত। যেহেতু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আদালতের বাধ্যকরণ ক্ষমতা আছে। সেহেতু যথার্থভাবে এই গুরুদায়িত্ব পালন করা সহজ ও সঠিক; কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা এখনও খুব উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। অবশ্য প্রশংসনীয় কিছু উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেয়া হয়েছে। যদি আন্তর্জাতিকভাবে আদালত প্রতিষ্ঠা করে সেই আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মানবাধিকার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তাহলে মানবাধিকারের ইতিহাসে তা হবে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আন্তর্জাতিক তদারকি

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় দুই ধরনের তদারকি কার্যকর আছে : (ক) রিপোর্টিং ব্যবস্থা এবং (খ) অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা।

রিপোর্টিং ব্যবস্থা

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য কী কী ধরনের পদ্ধতিগত ব্যবস্থা বিরাজমান, মানবাধিকার ভঙ্গের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান বোঝায়। রিপোর্টিং ব্যবস্থা মানবাধিকার বাস্তবায়নে অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা।

অভিযোগ দায়ের

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অন্য একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান সেসব অভিযোগ তদন্ত ও অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইউনেস্কোর কার্যব্যবস্থায় এই পদ্ধতি চালু আছে। মানবাধিকার বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু দেশ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে মানাবধিকারকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠান করে তোলা হয়েছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বলেন, "মানবাধিকার হলো মানব অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তি। মানবাধিকার সর্বজনীন, অবিভাজ্য এবং পরস্পর সম্পর্কিত। শান্তি ও উন্নয়ন অর্জনের জন্য জাতিসংঘের যে আকাঙ্খা তার হৃৎপিন্ড হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার আপনাদের অধিকার, এটিকে দখল করুন, রক্ষা করুন, উত্তরণ ঘটান এবং অব্যাহত রাখুন। একে লালন ও প্রতিষ্ঠা করুন।"[১৫]

তথ্য নির্দেশ

১. G.W Francis., *Recent Political Thought* (The World Press Private Ltd., 1966), p. 112.

২. K. R. Popper, *The Open Society and Enemies*, Vol.1 (London, Routledge and Kegan Paul, 1945), p.89.

৩. *Ibid*., p.90

৪. A. K. Mukhopadhyay, *Western political Thought*, *From Plato to Marx* (K.P. Bagchi and Co., Calcutta, 1980), p.13.

৫. *Ibid*., K.R. Popper, *The Open Society and Enemies*, p.92.

৬. Plato, *Laws* in E. Barker, *Greek Political Theory*, p.47.

৭. Berki, *History of Political Thought*, *A Short Introductio*n, (Rowman and Littlefield, 1977), p.49.

৮. C.L. Wayper, *Political Thought* (B.I. Publication, 1983), p.37.

৯. J. Gray, *Liberalism*, (World View An Imprint of Bookland Publishing Company, Delhi, 1998), p.89.

১০. D.L. Schaefer, "The sense and Non-sense of Jujstice: An Examination of John Rawls", *A Theory of Justice*, Political Science Reviewer, iii (Fall 1973), p.1,3, in Ebenstein, *Great Political Thinkers* (Oxford and IBH Publishing Company, 1966), p.379.

১১. অমর্ত্য সেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা*, অনুবাদ, অরবিন্দ রায় (আনন্দ, ২০০২) পৃ.৭১-৭২.

১২. R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, (Cambridge, Massachusetts, Harbard University Press, 1977), p. 81-149.

১৩. J. Donnely, "Human Rights: The Impact of International Action, International Journal" Vol-43, No-2, *Ethics in World Politics* (Spring, 1994), p. 244-245.

১৪. J.E.S. Fowcott, *Human Rights in National and International Law* (The Manchester University Press; Dobbs Ferry, New York, Oceana Publishing, 1968), p.180.

১৫. *প্রথম আলো*, ২ নভেম্বর ২০০৩.

সহায়ক গ্রন্থাবলী

সহায়ক গ্রন্থাবলী

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

Allen, Edward, *Law and Philosophy*, (ed), (New York: Englewood Cliffs), 1998.

Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Trans, David Rossaud and Others, ed. By D.A. Rees, (Oxford: Oxford University Press, 1962.

Asirvatham, E., *Political Theory*, (Lucknow: Upper India Pub.), 1967.

Baier, Kurt, "Why Should We Be Moral?", *Choice and Action*, Charles L. Reid (ed), (New York: Macmillan Publishing Co., Inc.), 1981.

Barker, E., *Political Thought in England*, 1848-1914, (London: Oxford University Press),1960.

Barker, E., *Principles of Social and Political Theory*, (London: Oxford University Press), 1967.

Bentham, j., *The Principles of Morals and Legislation*, (U.K.: Andrew Crooke and William Cooke),1911.

Bentham, J., *Principles of Legislation*. (Oxford: Clarendon Press), 1907.

Berki, R. N., A *History of Political Thought*; A Short Introduction, (London: Rowman and Littlefield) 1977.

Bluhm, W.T., *Theories of the Political System* (London: Prentice Hall), 1981.

Bluhm, W.T., *Classical Political Thought* (London: Prentice Hall), 1981.

Bosanquet, B., *The Philosophical Theory of State* (New York: Cambridge University Press), 2011.

Broad, C.D., *Ethics*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers), 1985.

Campbell, Tom, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd.), 1988.

Coker, F.W., *Recent Political Thought* (London: The World Press Private Ltd.),1966.

Crossman, R.H.S., *Plato Today*, 2nd ed (New York: George Allen & Unwin Ltd.), 1963.

Dunne, T., and N.J., Wheeler,-*Human Rights in Global Politics*, (Eds.), (Cambridge: Cambridge University Press), 1992.

Donnelly, J., *Universal Human Rights in Theory & Practice*. 2nd ed. (Ithaca & London: Cornell University Press), 2003.

Dunning, *A History of Political Theories. From Rousseau to Spencer* (Allahabad: Central Book Depot), 1967.

Ebenstein, W., *Great Political Thinkers* (Oxford: Oxford and IBH Publishing Company), 1966.

Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy, Complete and Unabridged*, 1972, ed., (Macmillan Publishing Co., Inc.& The Free Pres)s, 1972.

Fawcett, J.E.S., *Human Rights in National and International Law* (New York: The Manchester University Press, Oceana Publishing), 1968.

Gealirth, A., *Human Rights: Essays on Justification Applications*, (Chicago: Chicago University Press), 1982.

Gettell, R.G., *History of Political Thought*, (London: George Allen & Unwin Ltd.)1932.

Gray, J., *Liberalism*, (New Delhi: World View An Imprint of Bookland Publishing Company), 1998.

Green, T.H., *Lectures on the Principles of Political Obligation* (Cambridge: Cambridge University Press), 1886.

Haque, N., *Applied Philosophy*, A New Horizon of Thought, (Dhaka: Jatiya Sahitya Prakash), 2015.

Hare, R.M., *Freedom and Reason* (London: Oxford University Press), 1967.

Henry, D., Aiken *Hume's Moral and Political Philosophy*, (ed) (NewYork: Hafner Publishing Company), 1984.

Heywood, A., *Political Ideologies* (London: Palgrave, Macmillan2003).

Heywood, A., *Politics* (London: Palgrave foundations), 2004.

Hobbes, T., *Leviathan*, Andrew Crooke and William Cook, (Oxford: Clarendon Press 1909, Original print), 1651.

Hobhouse, L.T., *Social Evolution & Political Theory*, (New York: The Columbia University Press), 1911.

Hohfeld, W.N., *Fundamentals Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, (New Heaven: Yale University Press),1999.

Hollowell, *Main Crrents in Modern Political Thought* (New York: Holt, Rinchart and Winston), 1960.

Hospers, J., *Human Conduct*, (New York: Harcourt, Brace World, Inc.) 1961.

Hudson, W. D., *Modern Moral Philosophy*, (London: The Macmillan Press Ltd.), 1981.

Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, L.A. Selby-Bigge, (ed.) (London: Oxford University Press), 1967.

Johari, J.C., *Contemporary Political Theory, Basic Concepts and Major Trend* (New York: Sterling Publisher Pvt. Ltd.), 1980.

Jones, W.T, *Masters of Political Thought*, (London: George Harrap and Co. Ltd.), 1969.

Kant, I., *Critique of Pure Reason*, First edition 1781-Second 1787, (Cambridge: Hackett Publishing Company Inc. Indianapolis), 1996.

Lectures on Ethics, (Cambridge: Cambridge University Press), 1945.

Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, (Trans.) T. K. Abbott , London;Longmans,1962, p.27.

Laski, H.J., *A Grammar of Politics*, (New York: George Allen and Unwin Ltd.), 1937.

Locke, J., *Two Treatises of Civil Government* (ed) Peter Laslett, (London: Cambridge University Press), 1960.

MackenZie, J.S., *A Manual of Ethics*, (London: University Tutorial Press), 1980.

Mill, J.S., *On Utilitarianism, Liberty, Representative Government* (Introduction by A.D. Lindsay) (London: Everyman's Library), 1964.

Mill, J.S., *On Liberty* (London: Everyman's Library), 1964.

Mukhopadhyay, A.K., *Western Political Thought*, From Plato to Marx (Calcutta: K.P. Bagchi and Co.), 1980.

Nozick, R., *Anerchy,State and Utopia*, (Oxford: Basic Blackwell),1974.

Popper, K.R., *The Open Society and Its Enemies*, Vol.1 (London: Routledge and Kegan Paul), 1977.

Raphael, D.D., *Problems of Political Philosophy*, (London: Macmillan and Co. Ltd.), 1970.

Raphael, D.D., *Moral Philosophy* 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press), 1994.

Rawls, J., "*Ethics and Social Justice*" *Great Traditions in Ethics*, 5th ed., Ethel M. Albert et. al. (eds) (Belmont: Wadsworth Publishing Company),1984.

Richard, B. Brandt. *Social Justice* et.al (Englewood Cliffs: A Spectrum Book, Prentice- Hall, Inc.) 1962.

Risely, H.H., *Tribes and Castes of Bengal*, V-1 (Calcutta: Printed at the Bengal Secretariat Press), 1891.

Ritchi, D.G., *Natural Right*, (London: Routledge and Kegan Paul), 1952.

Ross, D., *Kant's Ethical Theory*, (Oxford: Clarendon Press),1953.

Rousseau J.J. *The Social Contract*, trans. Maurce Cramston. (USA, Penguin: Penguin Classics Kessinger Publishing), 2004.

Sabine, G., H., *A History of Political Theory* (London: Oxford and IBH Publishing Co. ,1968.

Simmonds, N.E., *Philosophy of Law*, (New York: Harcourt Brace College Publishers), 1996.

Steiner, H., *An Essay of Rights*, (London: Routledge and Kegan Paul), 1998.

Thomas, A., *Summa Theologica*, (New York: William of Ockham), 1973.

Volkov, F. M., *Ethics*, et. (eds), (Moscow: Progress Publishers), 1989.

V. D., Mahajan, *Political Theory*, (New Delhi: S. Chand & Company Ltd.),1988.

Waldron, Jeremy, *The Right of Private Property*, (Oxford: Clerendon Press), 1988.

Warnock, G.J., *Contemporary Moral Philosophy*, (London: Lawrence and Wishart), 1967.

Watson, Gray, *Free Will*, (ed.) (London: Oxford University Press), 1982.

Wayper, C. L., *Political Thought*, (London: B.I Publications), 1975.

Wellmar, C., *Morals and Ethics*, (New Jersey: Prentice Hall), 1988.

Zamir, Muhammad, *Human Rights: Issue and International Law*, (Dhaka: University Press Limited), 1990.

বাংলা গ্রন্থাবলী

অমর্ত্যসেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা*, অনুবাদ, অনুবাদক অরবিন্দ রায়, আনন্দ, ২০০২।

ইসলাম, মোঃ নুরুল, *মানবাধিকার ও সমাজকর্ম*, (নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা), ২০০৫।

ই. কান্ট, *নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি*, অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ১৯৮২।

কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড- ১, অংশ-১ (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো), ১৯৮৮।

খান, হাফিজ রশিদ, *আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন), ২০০৯।

খানম, রাশিদা আখতার, *নীতিবিদ্যা: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, (জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন), ঢাকা, ২০০২

চক্রবর্তী, দেবাশিস, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান*, (সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টারপ্রাইজেস (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬)

জোয়ার্দ্দার, মাহবুল-উল-হক, *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ১৯৮৮।

দোহা, এস. এম., *বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত*, (অর্কিড প্রকাশন, ঢাকা), ২০০৫।

নিকেল, জেমস ডব্লিউ, অনুবাদ-হোসেন, আফতাব, *মানবাধিকারের তাৎপর্য*, (বাংলা একাডেমী), ঢাকা, ১৯৯৬।

বেসিন, পিয়েরে, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, অনুবাদ-সুফিয়া খান, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ১৯৯৭।

মার্কস, কার্ল ও্ এঙ্গেলস ফ্রেডারিক কমিউনিস্ট পার্টির্র ইশতেহার, *রচনা সংকলন*, প্রথম খন্ড,প্রথম অংশ।

মাহমুদ, ফিরোজ, *বাংলাদেশের আদিবাসী*, (অনু:), বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯২।

রহমান, গাজী শামসুর, *মানবাধিকার ভাষ্য*, (বাংলা একডেমী, ঢাকা), ১৯৯৪ ।

শেখ আবদুল, ওয়াহাব, *কান্টের নীতিদর্শন*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), ১৯৮২।

শেখ আবদুল, ওয়াহাব, *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ১৯৮৬।

শওকতুজ্জামান, সৈয়দ, *মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ*, (রোহেলো পাবলিকেশন, ঢাকা), ২০০৫।

সরদার ফজলুল করিম, *এরিস্টটলের পলিটিকস*, অনূদিত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা), ১৯৮৩।

সরদার ফজলুল করিম, *প্লেটোর রিপারলিক*, অনূদিত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), ১৯৯৮।

সেলিম, মিয়া মুহাম্মদ ও রহমান, লুৎফর,-*মানবাধিকার: সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ*, (: নভেল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা), ২০০৫।

সহায়ক প্রবন্ধ ও সাময়িকী:

Donnely, J., "Human Rights: The Impact of International Action, International Journal" Vol-43, No-2, Ethics in world Politics (Spring), 1994.

Grotius, Hugo, *Annals and History of the Low Countries*; Manuscript 1612), (Pub. Amsterdam), 1957.

Kohli, A.S., Sharma, S.R., *Encyclopedia of Social Welfare and Administration*, Vol. 5, (New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.), 1996.

Leszek Kolakkowski, *Marxism and Human Rights*, Daedalus, Vol.112, No.4, Human Rights, 1983.

Moses, Moskowity, (1999), *Human Rights and World Order*, (New York: Ocean Publications Inc & Transcction Inc. New Brunswick, New Jersey), 1978.

Munim, F.K.M., *Rights of the Citizen Under the Constitution and Law*, Bangladesh Institute of Law & International Affairs, Dhaka, 1975.

Noel and Rita Timms, *Dictionary of Social Welfare*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1977), (Great Britain, Hobbs The Printers Ltd.1982).

Rawls, J., "Distributive Justice" in Peter Laslett and W.G. Runciman (ed.s) *Philosophy, Politics and Society* (III Series) (Oxford), 1967.

Rawls, J., "A Theory of Justice", Aeon j. Skoble & Tibor. R. Machan, *Political Philosophy Essential Selections*, (Delhi: Pearson Education), 2007.

Rokeya, Begum, '*Human Rights-An Overview in Historical Perspective*'. The *Journal of Social Development*, Vol.12, No.1, Dec-1997.

Sen, Amartya., *Human Rights and Asia Values*. The author presented it in a Morgenthau Memorial lecture on Ethics and foreign Policy in a conference in New York dated on1st May, 1997.

Encyclopaedia of Social Work (1995) NASW Press, Washington, D.C Vol. 2.

The New Enclopaedia Britannica (1978), Vol-2.

The Social Work Dictionary, 3rd Ed, NASW Press, Washington, D.C.

আহমেদ, মুহাম্মদ শফিক ও আমীন, মুহাম্মদ রুহুল,- *'ইসলামে মানবাধিকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১৯৯৬ যুক্তসংখ্যা ৪৭, ৪৮, ৪৯।

ডঃ ডগলাস লারটন, *রুজভেল্ট'স ফরেন পলিসি*, ১৯৩৩, ১৯৪১: ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, আন এডিটেড স্পীচ (টোরেন্টোঃ লংম্যানস গ্রিন),১৯৪২।

চাকমা, নীরুকুমার, মানবাধিকার ও নৈতিকতা, *বিশ্ব দর্শন দিবস*-২০১২, (দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র,ঢাকা), ২০১২।

পাটোয়ারী, মফিজুল ইসলাম ও আখতারুজ্জামান,- মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তাদানের মূলনীতি, *হিউম্যানিষ্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ*, ঢাকা, ২০০১।

বারী, এম এরশাদুল (১৯৮৯), আইনের শাসন ও মানবাধিকার, *বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ও প্যারালিগ্যাল ট্রেনিং সার্ভিসের সেন্টার*।

ভুট্টো, মোস্তাফাজামান, *Amity –A Voice of Humanity*, Vol-1, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), ২০০২।

মানবাধিকার: অন্ধকার থেকে আলোর পথে, *বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার সমিতি*, ঢাকা, ১৯৯৯।

মানবাধিকার সনদ, ১৯৪৮।